POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ ۘ
وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّآ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ؕ وَاِنْ لَّمْ يَنْتَهُوْا
عَمَّا يَقُوْلُوْنَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ (المائدہ:74)

নিশ্চয় তাহারা কুফরী করিয়াছে যাহারা বলে, 'আল্লাহ্ তিনের মধ্যে তৃতীয়'; অথচ এক মা'বুদ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই। এবং তাহারা যাহা বলিতেছে উহা হইতে তাহারা যদি নিবৃত্ত না হয় তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহাদিগকে নিশ্চয় যন্ত্রণাদায়ক আযাব স্পর্শ করিবে।

(আল মায়েদা: ৭৪)

بسم الله الرحمن الرحيم   نحمده ونصلي على رسوله الكريم   وعلى عبده المسيح الموعود
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ

খণ্ড
10

বদর
সাপ্তাহিক কাদিয়ান
Weekly
BADAR Qadian
Bangla

সংখ্যা
1-2

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 2-9 Jan 2025 9-16 জামাদিউস সানি-1445 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

মিসকীনের সংজ্ঞা

১৪৭৬) হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: সেই ব্যক্তি মিসকীন নয় যে দুই গ্রাস অন্নের জন্য (বাড়ি বাড়ি) যাচনা করে বেড়ায়, বরং সেই ব্যক্তি মিসকীন যে অভাবী, সংকোচ করে এবং মানুষের কাছে গিয়ে যাচনা করে না।

যাচনা করাকে ভর্ৎসনা এবং এর আযাব

১৪৭৪) হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম (সা.) বলেছেন-'মানুষ লোকের কাছে যাচনা করে বেড়ায়, এমনকি কিয়ামত দিবসে সে এমন অবস্থায় আসবে যখন তার মুখমণ্ডলে মাংসের একটি টুকরোও থাকবে না।'

১৪৭৭) হযরত মুগাইরাহ বিন শোবা লেখেন- 'আমি নবী (সা.) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলতেন- আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের জন্য তিনটি বিষয় অপছন্দ করেছেন। অনর্থক কথা বলা, সম্পদ অপচয় করা এবং অত্যধিক প্রশ্ন করা।

যাচনা করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ

১৪৮০) হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন:

তোমাদের মধ্য থেকে যদি কোন ব্যক্তি রজ্জু নিয়ে সকালে জঙ্গালের দিকে রওনা হয়ে যায় এবং জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করে সেগুলি বিক্রি করে নিজের অন্ন সংস্থান করে এবং সদকাও করে। তার জন্য লোকের কাছে চাওয়ার থেকে এই কাজটি উত্তম। (সহী বুখারী, ৩য় খণ্ড, কিতাবুয যাকাত, কাদিয়ান থেকে প্রকাশিত)

যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ নিজের উপর একাধিক মৃত্যু নিয়ে আসে এবং বহু পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হয়, ততক্ষণ সে মানবজনমের প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারে না।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র বাণী

বয়আতের সারমর্ম গ্রহণ কর

এমন ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়ো না যে, নিছক বয়আত করলেই খোদা সন্তুষ্ট হন। এটি কেবল এক বহিবারণ মাত্র; শাস এর অভ্যন্তরে অবস্থান করে। খোসা কোও কাজে আসে না, শাসই (খাদ্য হিসেবে) গ্রহণ করা হয়। কতিপয় ফল এমনও হয় যাদের মধ্যে কোনও শাঁস থাকে না,অনেকটা মুরগীর ফাঁপা ডিম্বের ন্যায়,যার মধ্যে না থাকে কুসুম,না থাকে সাদা অংশ, যে ডিম কোনও কাজেও আসে না, আবর্জনা হিসেবে ফেলে দেওয়া হয়। অবশ্য ক্ষণিকের তরে তা শিশুদের খেলার সামগ্রী হলেও হতে পারে।

অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি বয়আত ও ঈমানের দাবি করে, তার মাঝে যদি এই পূর্বোক্ত দুইটি বিষয়ের শাঁস বিদ্যমান না থাকে, তবে এমন ব্যক্তির ভীত হওয়া উচিত। কেননা এমন সময় উপস্থিত হয়, যখন সেই ফাঁপা ডিমের ন্যায় সামান্য আঘাতেই চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হবে।

অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি বয়আত ও ঈমানের দাবি করে,তার আত্মপর্যালোচনা করে দেখা উচিত যে, সে খোসা নাকি শাঁস। যতক্ষণ শাঁস উৎপন্ন না হয়,ঈমান, ভালবাসা,আনুগত্য, বয়আত,ভক্তি, ইসলামের দাবিদার সত্যিকার দাবিদার নয়। স্মরণ রেখো, একথা সত্য যে, আল্লাহ্ তা'লার নিকট শাঁস বিহীন খোসার কোনও মূল্য নেই। ভালভাবে স্মরণ রেখো, জানা নেই, মৃত্যু যে কখন উপস্থিত হবে তা কারো জানা নেই। কিন্তু মৃত্য অবশ্যম্ভাবী। অতএব, কেবল (মৌখিক) দাবিকে মোটেই যথেষ্ট মনে করো না এবং তুষ্ট হয়ে যেও না; সেটা মোটেই উপকারী নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ নিজের উপর একাধিক মৃত্যু নিয়ে আসে এবং বহু পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হয়, ততক্ষণ সে মনুষ্যত্বের প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারে না।

মানুষ-এর মর্ম

'ইনসান' শব্দটি 'উনস-আন' থেকে উদ্ভুত। অর্থাৎ যার মধ্যে দু'টি প্রকৃত 'উনস' (ভালবাসা)-এর সমন্বয় ঘটেছে। প্রথমত, আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভালবাসা, দ্বিতীয়ত: মানবজাতির প্রতি সহমর্মিতার প্রতি ভালবাসা। যখন এই উভয় 'উনস' কোনও ব্যক্তির মধ্যে সৃষ্টি হয় , তখন তাকে বলা হয় মানুষ। আর এটিকেই মানবতার শাঁস বলা হয়, এই পর্যায়ে উপনীত হলে মানুষকে 'উলুল আববাব' বা বিবেকবান মানুষ হিসেবে পরিচয় লাভ করে। যতক্ষণ পর্যন্ত না এই বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয় সবই বৃথা। অজস্র দাবি কর এবং প্রদর্শন কর, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার নিকট , তাঁর নবী ও ফেরেশতাদের নিকট তুচ্ছ।

আম্বিয়াগণের দৃষ্টান্ত

এছাড়া একথাও স্মরণ রাখার যোগ্য যে, মানুষ মাত্রই দৃষ্টান্তের মুখাপেক্ষী, আর সেই দৃষ্টান্ত হল আম্বিয়াগণের দৃষ্টান্ত। আল্লাহ্ তা'লা বৃক্ষরাজির উপরও তাঁর বাণী লিখে দেওয়ার শক্তি রাখেন। কিন্তু তিনি যে পয়গম্বরদের প্রেরণ করেছেন এবং তাদের মাধ্যমে ঐশী বাণী অবতীর্ণ করেছেন, এর মাঝে এই রহস্য নিহিত ছিল যে, যাতে মানুষ সেই ঐশী জ্যোতির্বিকাশ প্রত্যক্ষ করে যা পয়গম্বরদের মাঝে প্রকাশিত হয়।

পয়গম্বরগণ ঐশী জ্যোতির্বিকাশের প্রকাশস্থল এবং খোদার রূপ হয়ে থাকেন। আর প্রকৃত মুসলমান এবং ধর্মের অনুসারী সেই ব্যক্তি যে পয়গম্বরের বিকাশস্থল হয়। সাহাবাগণ এই রহস্যকে দারুণভাবে অনুধাবন করেছিলেন; তাঁরা রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর আনুগত্যে এমনভাবে বিলীন হয়েছিলেন যে তাদের নিজেদের অস্তিত্ব বলে কিছু ছিল না। যে কেউ তাদেরকে দেখত, তাদেরকে বিমোহিত অবস্থায় দেখতে পেত। অতএব, স্মরণ রেখো, এই যুগেও সাহাবাগণের ন্যায় সেই তন্ময়মতা ও আনুগত্যে বিলীনতা তৈরী হলে তবেই ভক্ত ও অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দাবী করা সঙ্গত ও বস্তুনিষ্ঠ হবে। একথা ভালভাবে নিজেদের মন-মস্তিষ্কে গেঁথে নাও যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমাদের মাঝে আল্লাহ্ তা'লা অধিষ্ঠিত হন এবং তাঁর গুণাবলী তোমাদের মাঝে প্রকাশিত হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা শয়তানী রাজত্বের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারবে না।

শয়তান মানুষকে মিথ্যা, অন্যায়, হত্যা, আবেগ, অসম-উচ্চাশা, বাহ্যাড়ম্বর এবং আত্মশ্লাঘার দিকে আহ্বান করে। এর বিপরীতে আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে উচ্চ নৈতিকতা, ধৈর্য, আত্মবিলীনতা, খোদার প্রতি নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা প্রদর্শন, ঈমান এবং সফলতার দিকে আহ্বান করে। মানুষ এই দুইয়ের টানাপোড়েনের মধ্যে রয়েছে। যার প্রকৃতিতে পুণ্য রয়েছে, সে শয়তানের অজস্র আহ্বান এবং আবেদন অগ্রাহ্য করেও সেই পুণ্য প্রকৃতি এবং অন্তরের পবিত্রতার কল্যাণে আল্লাহ্ তা'লার দিকে ধাবিত হয় এবং খোদা তা'লার মাঝেই নিজের আনন্দ, শান্তি ও স্বস্তি খুঁজে পায়।

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫৩)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

জুমআর খুতবা

“মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) চাইলে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মক্কায় প্রবেশ করতে পারতেন। কিন্তু তিনি (সা.) যেহেতু এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, প্রথমে তিনি মক্কাবাসীদের অনুমতিক্রমেই তওয়াফ করার চেষ্টা করবেন। আর মক্কাবাসীরা স্বয়ং যুদ্ধ আরম্ভ করে যুদ্ধের জন্য বাধ্য করলেই কেবল তিনি যুদ্ধ করবেন। তাই মক্কার রাস্তা উন্মুক্ত থাকা সত্ত্বেও তিনি (সা.) হুদায়বিয়াতে শিবির স্থাপন করেন।”

[হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)]

“এমন অনেক মু’জেযা তথা অলৌকিক নিদর্শন রয়েছে যা মহানবী (সা.) কেবলমাত্র ব্যক্তিগত শক্তিতে বা নৈপুণ্যে প্রদর্শন করেছেন, যাতে দোয়ার কোনো হাত ছিল না। অনেক সময় একটি পাত্রে রাখা সামান্য পরিমাণ পানির মধ্যে নিজের আঙ্গুল প্রবেশ করিয়ে তা এত পরিমাণে বাড়িয়ে দেন যে, সকল সেনা, উট এবং ঘোড়া সেই পানি পান করার পরও সেই পানি আগের পরিমাণেই বিদ্যমান থাকে। আবার অনেক সময় দু –চারটি রুটির ওপরে হাত রাখার ফলে তা দ্বারা সহস্র সহস্র ক্ষুধার্ত–তৃষ্ণার্তের উদর পূর্তি করে দেয়। আবার কখনো সামান্য দুধকে তাঁর পবিত্র ঠোঁটের স্পর্শে বরকতমণ্ডিত করে তা দ্বারা একটি গোটা দলের পেট ভরে দিয়েছেন। আবার কোনো কোনো সময় লবণাক্ত পানির কূপে তাঁর পবিত্র মুখের লালা ফেলে সেই পানি একেবারে সুমিষ্ট করে দিয়েছেন। আর কখনো কখনো গুরুতর আহতদেরকে নিজের হাতের স্পর্শে সুস্থ করে দিয়েছেন। আবার কখনো যুদ্ধের কোনো আঘাতের কারণে বাইরে বের হয়ে আসা চোখের অক্ষিগোলককে নিজের হাতের কল্যাণে আবার ঠিক করে দিয়েছেন। এরূপ আরও অনেক কাজ নিজের ব্যক্তিগত ক্ষমতায় করেছেন যার পেছনে এক অদৃশ্য ঐশী শক্তি সম্পৃক্ত ছিল।”

[হযরত মসীহ মওউদ(আ.)]

“সফরকালে এমন এক সময় আসে যখন মহানবী (সা.)–এর ব্যবহৃত বদনাটি ছাড়া সকল ঘটিবাটি পানিশূন্য হয়ে যায়। এ সময় সাহাবীদের পক্ষ থেকে পানি (শেষ হওয়ার) অনুযোগ শুনে মহানবী (সা.) তাঁর বদনার মুখের ওপর নিজের পবিত্র হাত রাখেন এবং বদনার মুখ নিচু করে সাহাবীদের বলেন, এখন তোমরা নিজেদের পাত্র নিয়ে আসো এবং (পানি) ভরে নাও। বর্ণনাকারী বলেন, সে সময় তাঁর আঙ্গুলের ভেতর থেকে এমনভাবে পানি প্রস্ফুটিত হচ্ছিল যেন একটি ঝর্ণা প্রবাহিত হচ্ছে। এমনকি সবাই নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী পানি সংগ্রহ করেন এবং মুসলমানদের কষ্ট দুর হতে থাকে। ”

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ:৭৫১)

সৈয়্যদনা আমিরুল মো’মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ১৫ নভেম্বর, ২০২৪, এর জুমুআর খুতবা (১৫ নবুয়ত, ১৪০৩ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

اَشۡهَدُ اَنۡ لَّاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحۡدَهٗ لَا شَرِيۡكَ لَهٗ وَاَشۡهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبۡدُهٗ وَرَسُوۡلُهٗ

اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيۡطٰنِ الرَّجِيۡمِ- بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ-

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ- الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ- مٰلِكِ يَوۡمِ الدِّيۡنِ- اِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَاِيَّاكَ نَسۡتَعِيۡنُ-

اِهۡدِنَا الصِّرَاطَ الۡمُسۡتَقِيۡمَ- صِرَاطَ الَّذِيۡنَ اَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ ۙ غَيۡرِ الۡمَغۡضُوۡبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا الضَّآلِّيۡنَ-

তাশাহ্হুদ, তা’উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,আজ হুদায়বিয়ার সন্ধির প্রেক্ষাপটে আলোচনা শুরু করব। হুদায়বিয়ার সন্ধি ষষ্ঠ হিজরীর জিলক্বদ মোতাবেক ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ (মাসে) সংঘটিত হয়েছিল। একে হুদায়বিয়ার যুদ্ধাভিযানও বলা হয়। হুদায়বিয়ার যুদ্ধাভিযান সম্পর্কে আল্লাহ্ তা’লা একটিসম্পূর্ণ সূরা, অর্থাৎ সূরা ফাতাহ্ অবতীর্ণ করেছেন, এই আশিসময় আয়াত দ্বারা যার সূচনা হয়েছে। আল্লাহ্ তা’লা বলেন,

اِنَّا فَتَحۡنَا لَكَ فَتۡحًا مُّبِيۡنًا ﴿۲﴾ لِّيَغۡفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنۡ ذَنۡۢبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعۡمَتَهٗ عَلَيۡكَ وَيَهۡدِيَكَ صِرَاطًا مُّسۡتَقِيۡمًا ﴿۳﴾ وَّيَنۡصُرَكَ اللّٰهُ نَصۡرًا عَزِيۡزًا ﴿۴﴾ (الفتح آیات 2تا4)

অর্থাৎ, নিশ্চয় আমরা তোমাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি যেন আল্লাহ্ তা’লা তোমাকে তোমার ভূত–ভবিষ্যতের সকল ভুলত্রুটি ক্ষমা করেন আর তোমার প্রতি স্বীয়অনুগ্রহরাজি পূর্ণ করেন এবং (তোমাকে) সরল–সোজা পথে পরিচালিত করেন। আর আল্লাহ্ তোমাকে সেই সাহায্য করুন যা সম্মান ও বিজয়ের সাহায্য। (সূরা আল্ ফাতাহ্: ২–৪)

গযওয়ায়ে হুদায়বিয়াকে কেন হুদায়বিয়ার যুদ্ধাভিযান বলা হয় এবং এর পরিচিতি কি– তা সংক্ষেপে তুলে ধরছি। হুদায়বিয়া একটি কূপের নাম ছিল, যে কারণে এই স্থানটির নাম হুদায়বিয়া হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। ইসলামের সূচনালগ্নে এই কূপটি পথিক এবং হাজীদের প্রয়োজনে কাজে আসতো, কিন্তু (সেখানে) কোনো বসতি ছিল না। হুদায়বিয়া মক্কা থেকে ১ মারহালা অর্থাৎ নয় মাইল দূরত্বে অবস্থিত। আর মক্কা থেকে মদীনার দূরত্ব প্রায় ২৫০ মাইল। এভাবে মদীনা থেকে হুদায়বিয়ার দূরত্ব প্রায় ২৪১ মাইলে দাঁড়ায়। হুদায়বিয়া মক্কার হেরেমের পশ্চিম প্রান্ত এবং কারো কারো মতে এর অধিকাংশ অংশ হেরেমের অন্তর্ভুক্ত আর কিছু অংশ হেরেমের বাইরে অবস্থিত। হুদায়বিয়ার এই স্থানটিতেই মুসলমান এবং কুরাইশের মাঝে চুক্তি হয়েছিল, যাকে হুদায়বিয়ার সন্ধি বলা হয়। বিভিন্ন রেওয়ায়েতে একে হুদায়বিয়ার যুদ্ধও বলা হয়েছে।

একটি রেওয়ায়েতে এটিকে তিহামার যুদ্ধও বলা হয়েছে। মক্কা এবং এর আশেপাশের এলাকাকে প্রচণ্ড গরম এবং মরুঝড়ের কারণে তিহামা বলা হতো। এ কারণে এটি তিহামা নামে পরিচিতি লাভ করে।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৭০) (এটলাস সীরাত নববী ,পৃ: ৩২৬) (আসসহীহ মিন সীরাতিন নবী আল আযাম, খণ্ড–১৫, পৃ: ৫৯) (এনসাাইক্লোপিডিয়া সীরাতুন নবী , পৃ: ১৮৮) (আল মুজামুল আওসাত, ২য় খণ্ড,পৃ: ৩৫৬) (সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৮৭)

এর কারণ কী ছিল? বিভিন্ন রেওয়ায়েত এবং ইতিহাস থেকে জানা যায়, মহানবী (সা.) একটি স্বপ্নের ভিত্তিতে হুদায়বিয়া সফর করেছিলেন। রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.)–কে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে, তিনি (সা.) তাঁর সাহাবীদের সাথে শান্তিপূর্ণ অবস্থায় নিজেদের মাথা মুণ্ডন করে এবং চুল কেটে মক্কায় প্রবেশ করেছেন এবং তিনি (সা.) বায়তুল্লাহ্তে প্রবেশ করেছেন এবং এর চাবি গ্রহণ করেছেন। আর আরাফাতের ময়দানে অবস্থানকারীদের সাথে অবস্থান করেছেন। অর্থাৎ সেখানে অবস্থান করেন। তখন মহানবী (সা.) আরবের অধিবাসী এবং আশেপাশের বেদুঈনদের ডাকেন যেন তারা সবাই তাঁর (সা.) সাথে যাত্রা করে। এই সফরে মুসলমানদের কাছে তরবারি ছাড়া অন্য কোনো অস্ত্র ছিল না আর তা–ও ছিল খাপবদ্ধ। অর্থাৎ তরবারি খাপের ভেতরে ছিল। সে–যুগে বাড়ি

থেকে বের হওয়ার সময় প্রত্যেকেই নিজের সাথে তরবারি রাখতো। তাই এটি মনে করার কোনো কারণ নেই যে, যার কাছে তরবারি রয়েছে সে অবশ্যই যুদ্ধ করবে। হযরত উমর (রা.) তাঁর (সা.) সমীপে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আপনি যদি আবু সুফিয়ান এবং তার সাঙ্গপাঙ্গাদের পক্ষ থেকে মুসলমানদের জন্য কোনো আশঙ্কা অনুভব করেন তাহলে আপনি কেন যুদ্ধের জন্য সাজসরঞ্জাম সাথে নিচ্ছেন না? তিনি (সা.) বলেন, যেহেতু আমি ওমরা-র উদ্দেশ্যে যাচ্ছি তাই নিজের সাথে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যেতে চাই না।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) 'সীরাত খাতামান্ নবীঈন' পুস্তকে মহানবী (সা.)-এর এই স্বপ্নের উল্লেখ করতে গিয়ে এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (সা.) এই স্বপ্ন দেখার পর তাঁর সাহাবীদের তাহরীক করেন, তারা যেন ওমরা-র উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। ওমরা হলো এক প্রকার ছোটো হজ্জ, যাতে হজ্জের কিছু অবশ্য করণীয় বর্জন করে কেবল বায়তুল্লাহ্ তওয়াফ বা প্রদক্ষিণ এবং (পশু) কুরবানী করা হয়। আর হজ্জের বিপরীতে এর জন্য বছরের কোনো নির্দিষ্ট সময়ও নির্ধারিত ছিল না, বরং এই ইবাদত যে-কোনো মৌসুমে পালন করা যায়। এ উপলক্ষ্যে মহানবী (সা.) সাহাবীদের মাঝে এই ঘোষণাও করেন যে, এই সফরে যেহেতু কোনো প্রকার যুদ্ধ করা উদ্দেশ্য নয়, বরং শুধুমাত্র এক শান্তিপূর্ণ ধর্মীয় ইবাদত সম্পাদন করা হলো মুখ্য উদ্দেশ্য, তাই মুসলমানদের উচিত এই সফরে যেন নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র সাথে না নেয়, বরং আরবের ঐতিহ্য অনুযায়ী কেবল নিজেদের তরবারিকে খাপবদ্ধ করে পথিকের ন্যায় নিজের সাথে রাখা যেতে পারে।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৭৪৯)

হুদায়বিয়ার যুদ্ধের সময় মুসলমানদের সংখ্যা কত ছিল? এ বিষয়েও মতভেদ পাওয়া যায়। একটি রেওয়ায়েতে আছে, এক হাজারের কিছু বেশি সাহাবী ছিলেন। এক রেওয়ায়েতে এক হাজার তিনশ' উল্লেখ হয়েছে। আরেক বর্ণনায় আছে, এক হাজার চারশ' (সাহাবী) ছিলেন। মোটকথা, রেওয়ায়েতে সতেরোশ' পর্যন্ত সংখ্যা বর্ণনা করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ এক হাজার থেকে নিয়ে সতেরোশ' পর্যন্ত বিভিন্ন রেওয়ায়েত রয়েছে।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল মানাসিক, হাদীস-১৬৯৪) (বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, হাধী-৪১৫৫) (ফতহুল বারি, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৫৫৯)

যাত্রার সময় হলে কুরবানীর পশুগুলোকে হযরত নাজিয়া বিন জুনদুব আসলামী (রা.)-র হাতে সোপর্দ করা হয়, যিনি সেগুলোকে যুল-হুলায়ফায় নিয়ে যান। যুল-হুলায়ফাও মদীনা থেকে ছয় বা সাত মাইল দুরত্বে অবস্থিত একটি জায়গা। যাত্রার প্রাক্কালে মহানবী (সা.) মদীনায় সর্বদা তাঁর স্থলাভিষিক্ত বা ভারপ্রাপ্ত আমীর নিযুক্ত করতেন। ইবনে সা'দ (রা.)-র রেওয়ায়েত অনুযায়ী এই যাত্রার প্রাক্কালে তিনি (সা.) মদীনায় হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উম্মে মাকতুম (রা.)-কে স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেন। যদিও ইবনে হিশামের রেওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত নুমায়লা বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.)-কে স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করা হয়। আর বালাযুরী, হযরত আবু রুহম কুলসুম বিন হুসাইন (রা)-র কথা উল্লেখ করেছেন। আবার কারো কারো মতে, হযরত ইবনে উম্মে মাকতুম (রা.)-কে নামাযের ইমাম নিযুক্ত করেন এবং বাকি সবাইকে স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেন। বিভিন্ন রেওয়ায়েত রয়েছে।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৩৩)

মহানবী (সা.) এবং সাহাবীদের সফরের প্রস্তুতি এবং যাত্রার বিশদ বিবরণ এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) (যাত্রার) এই ঘোষণা দেয়ার পর তাঁর বাড়িতে প্রবেশ করে গোসল করেন এবং সুহারের তৈরী দুটি কাপড় পরিধান করেন। সুহার ইয়েমেনের একটি বসতি এবং এই (এলাকার) কাপড় উন্নত মানের হতো। এরপর তিনি (সা.) বাইরে আসেন এবং দরজার কাছে থাকা তাঁর উটনী কাসওয়া'র ওপর আরোহণ করেন। এই সফরে মহানবী (সা.)-এর পবিত্র স্ত্রী হযরত উম্মে সালামা (রা.) তাঁর সাথে ছিলেন। মহানবী (সা.) যিলক্বদ মাসের শুরুতে সোমবার দিন যাত্রা আরম্ভ করেন আর যুল-হুলায়ফায় পৌঁছে সেখানে যোহরের নামায আদায় করেন। এরপর কুরবানীর পশু নিয়ে আসতে বলেন, যেগুলোর সংখ্যা ছিল সত্তরটি, আর সেগুলোর গলার গানীয়া তথা মালা পরান। এরপর তিনি (সা.) কিছু উটকে চিহ্নিত করেন, অর্থাৎ সেগুলোর কুঁজে চিহ্ন লাগান যেন বুঝা যায় যে, এগুলো কুরবানীর উট। এরপর তিনি (সা.) হযরত নাজিয়া বিন জুনদুব (রা.)-কে নির্দেশ দিলে তিনি অবশিষ্ট পশুগুলোকে চিহ্নিত করেন (অর্থাৎ) সেগুলোকেও চিহ্নিত করা হয় এবং সেগুলোর গলায়মালা পরানো হয়। অন্যান্য মুসলমানরাও নিজেদের পশুগুলোর গলায় মালা পরান এবং চিহ্নিত করেন। এই সফরে মুসলমানদের কাছে দুইশ' ঘোড়া ছিল।

মহানবী (সা.)-এর ইহরাম বাঁধা সম্পর্কে এরূপ বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় যে, মহানবী (সা.) দু'রাকাত নামায পড়েন এবং যুল-হুলায়ফার মসজিদের দরজা থেকে (বাহনে) আরোহণ করেন। তিনি (সা.) ওমরা'র জন্য ইহরাম বাঁধেন যাতে লোকেরা বুঝতে পারে, তিনি (সা.) বায়তুল্লাহ্র যিয়ারত এবং এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছেন। এরপর তিনি (সা.) এই তালবিয়াহ্ পাঠ করেন-

لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ۔
اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ۔

অর্থাৎ, 'আমি উপস্থিত। হে আল্লাহ্! আমি উপস্থিত। আমি উপস্থিত, তোমার কোনোশরীক বা অংশীদার নাই। আমি উপস্থিত, সকল প্রশংসা ও অনুগ্রহ তোমারই এবং রাজত্ব তোমারই। তোমার কোনো অংশীদার নাই'।

মহানবী (সা.) কুরাইশের গতিবিধি জানার উদ্দেশ্যে, অর্থাৎ তারা কোনো দুষ্কৃতি করার দুরভিসন্ধি করছে কি না? একজন সংবাদ সংগ্রাহক হযরত বুসর বিন সুফিয়ান (রা.)-কে অগ্রে প্রেরণ করেন আর অতিরিক্ত সতকর্তাবশতঃ তিনি হযরত আব্বাদ বিন বিশর (রা.)-কে, আরেক রেওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত সা'দ বিন যায়েদ আশআলী (রা.)-কে বিশজন অশ্বারোহীর নেতা মনোনীত করে অগ্রে প্রেরণ করেন।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৩৩-৩৪)

বিভিন্ন স্থানে যাত্রা বিরতি দিয়ে যখন মহানবী (সা.) রওহা নামক স্থানে পৌঁছেন , যা মদীনা থেকে ৭৩ কি.মি. দূরত্বে অবস্থিত, তখন তিনি জানতে পারেন; লোহিত সাগরের তীরবতী গায়কা উপত্যকায় কিছু মুশরিক বা পৌত্তলিক রয়েছে আর তাদের পক্ষ থেকে মুসলমানদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তখন তিনি (সা.) হযরত আবু কাতাদা আনসারী(রা.)-র নেতৃত্বে যিনি ওমরা'র জন্য ইহরাম বাঁধেন নি, সাহাবীদের একটি দল সহ প্রেরণ করেন।

(ফতহুল বারি, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২৮) (সীরাত এনসাইক্লোপেডিয়া, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৫০)

এই সফরে কিছু মু'জেযা বা অলৌকিক নিদর্শনের উল্লেখ পাওয়া যায়। সফরকালেএকস্থানে লোকেরা মহানবী (সা.)-এর পাশে সমবেত হন, যখন তাঁর সামনে পানির একটি পাত্র ছিল আর তিনি তা দিয়ে ওযু করছিলেন। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, কী ব্যাপার? সাহাবীরা নিবেদন করেন, আপনার কাছে এ পাত্রে যে পানি আছে এ ছাড়া আমাদের কারো কাছে পান করার বা ওযু করার জন্য আর কোনো পানি (অবশিষ্ট) নাই। একথা শুনে মহানবী (সা.) এই পাত্রে নিজের হাত রাখেন। সে সময় তাঁর আঙ্গুলের মাঝ থেকে এমনভাবে পানির ফোয়ারা বইতে আরম্ভ করে, যেন পানির ঝর্ণা ধারা প্রবাহিত হচ্ছে। হযরত জাবের (রা.)বলেন, আমরা সবাই পানি পান করি এবং ওযু করি। যদি আমরা সংখ্যায় এক লক্ষও হতাম তথাপি সেই পানি আমাদের জন্য যথেষ্ট হতো অথচ তখন আমাদের সংখ্যা ছিল কেবলমাত্র পনের'শ। (সীরাতুল হালবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৪)

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) ইতিহাসের গ্রন্থাবলীর আলোকে এই ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, সফরকালে এমন এক সময় আসে যখন মহানবী (সা.)-এর ব্যবহৃত বদনাটি ছাড়া সকল ঘটিবাটি পানিশূন্য হয়ে যায়। এ সময় সাহাবীদের পক্ষ থেকে পানি (শেষ হওয়ার) অনুযোগ শুনে মহানবী (সা.) তাঁর বদনার মুখের ওপর নিজের পবিত্র হাত রাখেন এবং বদনার মুখ নিচু করে সাহাবীদের বলেন, এখন তোমরা নিজেদের পাত্র নিয়ে আসো এবং (পানি) ভরে নাও। বর্ণনাকারী বলেন, সে সময় তাঁর আঙ্গুলের ভেতর থেকে এমনভাবে পানি প্রস্ফুটিত হচ্ছিল যেন একটি ঝর্ণা প্রবাহিত হচ্ছে। এমনকি সবাই নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী পানি সংগ্রহ করেন এবং মুসলমানদের কষ্ট দূর হতে থাকে। "

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ:৭৫১)

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) এই ঘটনাটি উল্লেখ করে বর্ণনা করেন, "খোদা তা'লার সাথে সাক্ষাতের মানে (উপনীত হওয়ার) কল্যাণে অনেক সময় মানুষের দ্বারা এমন সব ঘটনা সংঘটিত হয় যা মানবীয় শক্তির ঊর্ধ্বে বলে প্রতীয়মান হয় এবং ঐশী শক্তির বৈশিষ্ট্য নিজের মাঝে ধারণ করে। এমন অনেক মু'জেযা তথা অলৌকিক নিদর্শন রয়েছে যা মহানবী (সা.) কেবলমাত্র ব্যক্তিগত শক্তিতে বা নৈপুণ্যে প্রদর্শন করেছেন, যাতে দোয়ার কোনো হাত ছিল না। অনেক সময় একটি পাত্রে রাখা সামান্য পরিমাণ পানির মধ্যে নিজের আঙ্গুল প্রবেশ করিয়ে তা এত পরিমাণে বাড়িয়ে দেন যে, সকল সেনা, উট এবং ঘোড়া সেই পানি পান করার পরও সেই পানি আগের পরিমাণেই বিদ্যমান থাকে। আবার অনেক সময় দু -চারটি রুটির ওপরে হাত রাখার ফলে তা দ্বারা সহস্র সহস্র ক্ষুধার্ত-তৃষ্ণার্তের উদর পূর্তি করে দেয়। আবার কখনো সামান্য দুধকে তাঁর পবিত্র ঠোঁটের স্পর্শে বরকতমণ্ডিত করে তা দ্বারা একটি গোটা দলের পেট ভরে দিয়েছেন। আবার কোনো কোনো সময় লবণাক্ত পানির কূপে তাঁর পবিত্র মুখের লালা ফেলে সেই পানি একেবারে সুমিষ্ট করে দিয়েছেন। আর কখনো কখনো গুরুতর আহতদেরকে নিজের হাতের স্পর্শে সুস্থ করে দিয়েছেন। আবার কখনো যুদ্ধের কোনো আঘাতের কারণে বাইরে বের হয়ে আসা চোখের অক্ষিগোলককে নিজের হাতের কল্যাণে আবার ঠিক করে

দিয়েছেন। এরূপ আরও অনেক কাজ নিজের ব্যক্তিগত ক্ষমতায় করেছেন যার পেছনে এক অদৃশ্য ঐশী শক্তি সম্পৃক্ত ছিল।”

(আয়েনায়ে কামালাতে ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৬৫-৬৬)

মহানবী (সা.)-এর মু’জেযা তথা অলৌকিক নিদর্শনাবলী প্রসঙ্গে তিনি (আ.) এসব কথা উল্লেখ করেছেন। মহানবী (সা.)-এর সফরের সংবাদ পাওয়া মাত্রই কুরাইশের সেনাবহিনী প্রস্তুত করার এবং সাহাবীদের সাথে মহানবী (সা.)-এর পরামর্শ করার উল্লেখও পাওয়া যায়। কুরাইশরা এ বিষয়টি জানা সত্ত্বেও যে, মুসলমানরা যুদ্ধের উদ্দেশ্যে নয়, বরং বায়তুল্লাহ্ শরীফ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে আসছে, মুসলমানদেরকে মক্কায় প্রবেশে বাধা দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং প্রত্যেক তরবারি ধারণে সক্ষম ব্যক্তি মুসলমানদেরকে প্রতিহত করার জন্য বের হয়ে আসে; এটি জেনেও যে, (মুসলমানরা) যুদ্ধের জন্য আসছে না। আর নিজেদের মিত্রদের সঙ্গে নিয়ে আট হাজার সৈন্য (সম্বলিত) সেনাদল গঠন করে মক্কার পশ্চিম প্রান্তে বালদাহ্ নামক উপত্যকায় শিবির স্থাপন করে এবং খালিদ বিন ওয়ালীদকে দুশ’ অশ্বারোহী সহ মহানবী (সা.) এবং সাহাবীদের পথ রোধ করার জন্য উসফান থেকে আট মাইল দূরত্বে কুরাউল গামীম নামক উপত্যকায় প্রেরণ করে।

(সুলাহ হুদাইবিয়াহ, পৃ: ১১৪-১১৯)

হযরত মিসওয়ার বিন মাখরামা এবং মারওয়ান বিন হাকাম (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) - উসফানের নিকটবতী (এলাকা) আশতাতের জলাধারে পৌঁছামাত্রই তাঁর সংবাদ সংগ্রহকারী বা অনুসন্ধানী তাঁর কাছে আসে। সে বলে, কুরাইশরা আপনার বিরুদ্ধে অনেক বড়ো সেনাদল জড়ো করেছে এবং আপনার বিরুদ্ধে বিভিন্ন গোত্রকে সমবেত করেছে আর তারা আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এবং আপনাকে বায়তুল্লাহ্ শরীফে প্রবেশে বাঁধা প্রদান করবে। তিনি (সা.) বলেন, হে লোকেরা! আমাকে পরামর্শ দাও। তোমরা কি মনে করো যে, যারা আমাদেরকে বায়তুল্লাহ্ যিয়ারতে বাঁধা দিতে চায়, আমি তাদের পরিবার -পরিজন ও সন্তান-সন্ততি সবার ওপর আক্রমণ করি আর তারা যদি আমাদের দিকে আসে তাহলে আমরা তাদেরকে পরাজিত করে ছাড়ি। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আপনি বায়তুল্লাহ্ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন। আপনি কাউকে হত্যা করার সংকল্প করেন নি আর নাই কারো সাথে যুদ্ধ করার। এজন্য আপনি সেই গৃহ অভিমুখে চলুন। আর যারা আমাদেরকে একাজে বাঁধা দিবে আমরা তাদের সাথে লড়াই করবো। (বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, হাদীস-৪১৭৮-৪১৭৯)

(অর্থাৎ, আমাদেরকে নিজেদের কাজ করতে থাকা উচিত, সফর অব্যাহত রাখা উচিত।) হযরত উসায়েদ বিন হুযায়ের (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)-র একথায় সহমত পোষণ করেন। হযরত আবু বকর (রা.)-র পর হযরত মিক্বদাদ (রা.) নিবেদন করেন, ‘হে আল্লাহ্র রসূল (সা.) আল্লাহ্র কসম! আমরা আপনাকে সেই কথা বলবো না যা বনী ইস্রাঈল তাদের নবী হযরত মূসা (আ.)-কে বলেছিল, তুমি এবং তোমার প্রভু গিয়ে যুদ্ধ করো, আমরা এখানেই বসে থাকবো। হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আপনি যান, আপনি এবং আপনার প্রভু যুদ্ধ করুন এবং আমরাও আপনার সাথে যুদ্ধ করবো।’ (সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৩৭)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তাঁর বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এই ঘটনাটি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, ‘মক্কাবাসীরা (মুসলমানদের আগমন সম্পর্কে) অবগত হওয়া মাত্রই সৈন্যবাহিনী নিয়ে উপস্থিত হয় এবং তারা মুসলমানদেরকে বলে, তোমাদেরকে এখানে আসার অনুমতি কে দিয়েছে? তারা বলে, আমরা যুদ্ধ করতে আসি নি, শুধুমাত্র ওমরা করতে এসেছি। এই স্থান তোমাদের কাছেও বরকতমণ্ডিত এবং আমাদের নিকটও। আমরা এর যিয়ারত করতে এসেছি, যুদ্ধ করতে নয়। তারা বলে, তওয়াফের তো প্রশ্নই উঠে না। (কাফিররা প্রত্যাখ্যান করে।) তোমাদের ও আমাদের মাঝে যুদ্ধ চলছে, যদি তোমরা মক্কায় প্রবেশ করো এবং তওয়াফ করে ফেরত যাও, তাহলে সমগ্র আরবে আমাদের নাক কাটা যাবে বা অসম্মান হবে। অর্থাৎ, তোমাদের শত্রুরা এসে তোমাদের গৃহ তওয়াফ করে গেছে! আমরা পুরো আরব বিশ্বকে অনুমতি দিতে পারি কিন্তু তোমাদেরকে দিতে পারব না।”

(সাইরে রূহানী (৭), আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২৪ , পৃ: ২৪৭)

যেমনটি বর্ণিত হয়েছে, খালিদ বিন ওয়ালীদ দুইশ’ সৈন্য সহ মহানবী (সা.)-এর কাফেলাকে প্রতিহত করার জন্য এবং মহানবী (সা.)-এর পথ রোধ করার জন্য সামনে অগ্রসর হয়। যখন মহানবী (সা.) জানতে পারেন তখন তিনি (সা.) খালিদ বিন ওয়ালীদের পথ থেকে সরে গিয়ে ভিন্ন পথ ধরে হুদায়বিয়ায় পৌঁছেন। যার বিশদ বিবরণে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেন, কয়েক দিনের পথ পাড়ি দিয়ে যখন তিনি (সা.) উসফান নামক স্থানে পৌঁছেন, যেটি মক্কা থেকে প্রায় দুই মঞ্জিল দূরত্বে অবস্থিত; তখন তাঁর (সা.) এর সংবাদ-সংগ্রাহক ফেরত এসে তাঁর (সা.) সমীপে সংবাদ দেয় যে, মক্কার কুরাইশরা ভীষণ উত্তেজিত এবং তারা তাঁকে প্রতিহত করার জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। এমনকি তাদের কয়েকজন নিজেদের উত্তেজনা ও হিংস্রতার বহিঃপ্রকাশের জন্য চিতার চামড়া পরিধান করে আছে। আর যে কোনো মূল্যে মুসলমানদের প্রতিহত করার জন্য যুদ্ধের দৃঢ় সংকল্প করেছে। এটিও জানা গেছে, কুরাইশরা নিজেদের কতিপয় দুর্ধর্ষ অশ্বারোহীর একটি সৈন্যদলকে খালিদ বিন ওয়ালীদের নেতৃত্বে অগ্রে প্রেরণ করেছে, (যিনি তখনো মুসলমান হয় নি।) আর এই সেনাদলটি বর্তমানে মুসলমানদের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। আর এই সেনাদলে ইকরামা বিন আবু জাহলও প্রমুখও রয়েছে। মহানবী (সা.) এই সংবাদ পেয়ে সাহাবীদেরকে মক্কার সুপরিচিত পথ ছেড়ে ডানদিক দিয়ে অগ্রসর হতে নির্দেশ প্রদান করেন, যাতে সংঘর্ষ এড়ানো যায়। অতএব, মুসলমানরা সমুদ্র দিক দিয়ে একটি দুর্গম ও কঠিন পথ ধরে অগ্রসর হতে থাকে।”(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৭৫০)

মহানবী (সা.) তাদের সাথে যুদ্ধ হোক তা পছন্দ করছিলেন না, কেননা তিনি যুদ্ধের জন্য নয় বরং ওমরা’র উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন।

যাহোক, তিনি সেখান থেকে সরে গিয়ে যথাস্থানে পৌঁছে যান। মুসলমানদের রাস্তা পরিবর্তন করে অন্য দিক দিয়ে চলে যাবার সংবাদ খালিদ বিন ওয়ালীদ ঘুণাক্ষরেও টের পায় নি। এমনকি খালিদ বিন ওয়ালীদ যখন ইসলামী সেনাদলের (ছুটে আসার উড়ন্ত) ধুলো দেখতে পায় তখন কুরাইশকে সতর্ক করার জন্য ছুটতে থাকে।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৩৮) (সুলাহ হুদায়বিয়া, পৃ: ১২৫)

মহানবী (সা.)-এর হুদায়বিয়াতে আগমন করার বিষয়ে রেওয়াতে এসেছে, হযরত মিসওয়ার বিন মাখযামা (রা.) এবং মারওয়ান (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) হুদায়বিয়ার প্রান্তরে পৌঁছে যান, এমনকি যখন তিনি (সা.) সেই গিরিপথে পৌঁছেন যেখান থেকে কুরাইশের দিকে নামা করা যায়; (তখন) তাঁর (সা.) উট তাঁকে নিয়ে বসে পড়ে। লোকজন সেটিকে দাঁড় করানোর জন্য হাক-ডাক দিলেও সেটি একইভাবে বসে থাকে। লোকেরা বলে, কাসওয়া বেঁকে বসেছে। মহানবী (সা.) বলেন, কাসওয়া বেঁকে বসে নি আর এটি তার স্বভাবও নয়, বরং হস্তিবাহিনীকে প্রতিহতকারী পবিত্র সত্তা অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা’লা একে থামিয়ে দিয়েছেন। এরপর তিনি (সা.) বলেন, সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! কুরাইশরা আল্লাহ্র পবিত্রতা ও সন্মানের প্রতি লক্ষ্য রেখে যা-ই দাবি করবে, আমি অবশ্যই তাদেরকে তা দিব। এরপর তিনি (সা.) উটনীকে ধমক দিলে সে উঠে দাঁড়ায়। তিনি বলেন, কুরায়রা যা-ই দাবি করবে, তাতে যদি আল্লাহ্র সন্মানে আঁচড় না লাগে তাহলে আমি তাদের দাবি পূরণ করবো। যাহোক, তিনি হাঁক দিলে উটনী পুনরায় চলতে আরম্ভ করে। তিনি (সা.) মক্কাবাসীদের দিক থেকে সরে যানএমনকি হুদায়বিয়ার অপর প্রান্তে স্বল্প পানির একটি জলাধারের নিকটে শিবির স্থাপন করেন। এটি বুখারীর রেওয়ায়েত। (বুখারী, কিতাবুশ শরুত, হাদীস-২৭৩১-২৭৩২)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন.এখানে তাঁর উটনী দাঁড়িয়ে যায় এবং সে সন্মুখে অগ্রসর হতে অস্বীকার করে। সাহাবীরা (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আপনার উটনী ক্লান্ত হয়ে গেছে তাই আপনি এর পরিবর্তে অন্য আরেকটি উটে আরোহণ করুন। কিন্তু তিনি (সা.) বলেন, না -না; এটি ক্লান্ত হয় নি বরং মনে হচ্ছে এটিই আল্লাহ্র অভিপ্রায়, আমরা যেন এখানেই অবস্থান করি। আমি এখানে অবস্থান করে মক্কাবাসীদের কাছে সকল পদ্ধতিতে অনুরোধ করব, তারা যেন আমাদেরকে (ওমরা) হজ্জ করার অনুমতি দেয়। আর (এ জন্য) তারা যে কোনো শর্তই দিক না কেন আমি তা মেনে নিব। ঐ সময় পর্যন্ত মক্কার সেনাদল, মক্কা হতে অনেক দূরত্বে অবস্থান করছিল এবং মুসলমানদের জন্য অপেক্ষা ছিলো।

মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) চাইলে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মক্কায় প্রবেশ করতে পারতেন। কিন্তু তিনি (সা.) যেহেতু এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, প্রথমে তিনি মক্কাবাসীদের অনুমতিক্রমেই তওয়াফ করার চেষ্টা করবেন। আর মক্কাবাসীরা স্বয়ং যুদ্ধ আরম্ভ করে যুদ্ধের জন্য বাধ্য করলেই কেবল তিনি যুদ্ধ করবেন। তাই মক্কার রাস্তা উন্মুক্ত থাকা সত্ত্বেও তিনি (সা.) হুদায়বিয়াতে শিবির স্থাপন করেন।”

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ৩০৬-৩০৭)।

বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে যে, হুদায়বিয়াতে যে অল্প পানির ঝরনার কাছে মুসলমানরা অবস্থান গ্রহণ করেছিল, মানুষ তা হতে অল্প অল্প পানি নেওয়া আরম্ভ করে। অল্প সময়ের মধ্যেই মানুষ সেটির পানি তুলে তা নিঃশেষ করে ফেলে আর মহানবী (সা.)-এর কাছে তারা তৃষ্ণার বিষয়ে অভিযোগ করে। (বুখারী কিতাবুশ শরুত, হাদীস-২৭৩১-২৭৩২)

হযরত নাজিয়া বিন আজম বর্ণনা করেন যে, হুদায়বিয়াতে মহানবী (সা.) এর কাছে যখন পানির ঘাটতির প্রচণ্ড অভিযোগ করা হয় তখন তিনি (সা.) আমাকে ডাকেন এবং নিজ তূণ হতে একটি তির বের করে আমাকে দেন। এরপর ঝরনার পানি একটি বালতিতে করে আনতে বলেন। আমি

তা নিয়ে আসি। তিনি (সা.) তা দিয়ে ওযু করেন এবং কুলি করে সেই পানি বালতিতে ঢেলে দেন। এরপর তিনি (সা.) আমাকে বলেন, এই পানি সেই শুকিয়ে যাওয়া ঝরনায় ঢেলে দাও। আর সেই পানিতে তিরটি গেঁ ড়ে দাও।তখন আমি তা-ই করলাম। অতএব আমি সেই খোদার কসম খেয়ে বলছি, যিনি তাঁকে (সা.) সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন, আমি অনেক কষ্টে সেখান হতে বের হয়ে আসি। চতুর্দিক হতে পানি আমাকে ঘিরে ফেলে। পানি ঢেলে তির গেঁথে দেওয়ার পর আমি সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলামআর তখনই কুয়ার ভেতর পানি বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর পানি এমনভাবে ফুটছিল যেভাবে পাতিলে পানি ফুটে। এমনকি পানি উপরে উঠে আসে এবং কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায়। মানুষ সেটির প্রান্ত হতে পানি ভরতে থাকে, এমনকি তাদের মধ্য হতে শেষ ব্যক্তিও নিজের পিপাসা নিবারণ করে নেয়। (সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৪১)

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এই সময়ের একটি বৃষ্টির কথা উল্লেখ করে বলেন, এটিও ইতিহাস গ্রন্থাবলি থেকে নেওয়া হয়েছে যে,সেই রাতেই অথবা এর নিকটবর্তী সময়ে বৃষ্টিও বর্ষিত হয়। অতএব যখন ফজরের নামাযের জন্য মহানবী (সা.) আগমন করেন তখন পুরো ময়দান পানিতে পূর্ণ সিক্ত ছিল। মহানবী (সা.) হাস্যবদনে সাহাবীদের বলেন, তোমরা কি জানো এই বৃষ্টির সময় তোমাদের খোদা কি বলেছেন? সাহাবীগণ রীতি অনুযায়ী বলেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলই ভালো জানেন।

তিনি (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমার বান্দাদের মাঝে কতক প্রকৃত ঈমানের সাথে এই সকাল করেছে। কিন্তু কতক কুফরের অবস্থায় পতিত হয়ে দোদুল্যমান হয়েছে। কেননা যে ব্যক্তি একথা বলেছে যে, আমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র আশিস ও দয়ায় এ বৃষ্টি হয়েছে, সে প্রকৃত ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু যে ব্যক্তি একথা বলেছে যে, এ বৃষ্টি অমুক অমুক নক্ষত্রের প্রভাবের কারণে হয়েছে সেক্ষেত্রে সে নিঃসন্দেহে চন্দ্র ও সূর্যের প্রতি যদিও বিশ্বাসী হয়েছে, কিন্তু সে আল্লাহ্‌র অস্বীকারকারী হয়েছে।"

এই নির্দেশের মাধ্যমে, যা তওহীদের সম্পদে পূর্ণ, মহানবী (সা.) সাহাবীদেরকে এই শিক্ষা দিয়েছেন যে, নিঃসন্দেহে উপকরণ ওকারণের শৃঙ্খলের অধীনে আল্লাহ্ তা'লা এ জগত ব্যবস্থাকে পরিচালনার জন্য বিভিন্ন ধরনের উপকরণ নির্ধারণ করে রেখেছেন আর বৃষ্টি ইত্যাদির ক্ষেত্রে মহাকাশের বিভিন্ন বস্তুর প্রভাব অস্বীকার করছি না, কিন্তু প্রকৃত তওহীদ হলো এই যে, মধ্যবর্তী উপকরণ থাকা সত্ত্বেও মানুষের দৃষ্টি যেন সেই শত পর্দার আড়ালে থাকা সত্তার প্রতি উদাসীন না হয়। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার প্রতি যেন কখনো উদাসীন না হয়। উপকরণ আল্লাহ্ তা'লাই প্রদান করেছেন আর তাঁর আদেশেই এসব উপকরণ ক্রিয়াশীল হয়ে থাকে- যিনি এই সমস্ত উপকরণের সৃষ্টিকর্তা এবং এই জগৎ ব্যবস্থার সমস্ত কারণের মূল কারণ, আর তিনি ছাড়া এসব বাহ্যিক উপকরণ একটি মৃত পোকার চেয়ে অধিক মূল্য রাখে না।" (সীরাত খাতামান্নবীঈন, পৃ: ৭৫১-৭৫২)

মহানবী (সা.)-এর জন্য আমর বিন সালেম এবং বুসর বিন সুফিয়ান-এর উপহারেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। লিখিত আছে যে, আমর বিন সালেম এবং বুসর বিন সুফিয়ান , যারা খুযাআ গোত্রের সদস্য ছিলেন, হুদায়বিয়ার সময় মহানবী (সা.)-কে বিভিন্ন বকরি এবং উষ্ট্রী উপহার দিয়েছিলেন। হযরত সা'দ বিন উবাদা (রা.)-কেও আমর বিন সালেম উট উপহার দিয়েছিলেন। হযরত সা'দ ছিলেন আমরের বন্ধু। হযরত সা'দ বিন উবাদা এই উপহার নিয়ে মহানবী (সা.)-এর কাছে আসেন এবং সংবাদ দেন যে, আমর তার জন্য উপহারস্বরূপ এই উট দিয়েছে। মহানবী (সা.) তখন বলেন, আমর আমাকেও উপহার দিয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা আমরের সম্পদে বরকত দান করুন। অতঃপর নির্দেশ দেন যে, উটগুলো জবাই করে সেগুলোকে সাহাবীদের মাঝে বণ্টন করে দাও আর বকরিগুলোকে সে ভাবেই বণ্টন করে তাদেরকে দিয়ে দাও। আর এই বণ্টনে তিনি (সা.) নিজেকেও অন্তর্ভুক্ত করেন। এরপরহযরত উম্মে সালামার কাছে উষ্ট্রীর মাংস প্রেরণ করা হয় যা অন্যদের কাছেও প্রেরণ করা হয়েছিল। আর মহানবী (সা.) নিজের বকরি থেকেও কিছু মাংস হযরত উম্মে সালামাকে প্রদান করেন এবং যে ব্যক্তি উপহার নিয়ে এসেছিল তাকে কাপড় উপহার প্রদান করার নির্দেশ দেন। (সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৪২)

এছাড়া তিনি (সা.) যে-সব উপহারসামগ্রী পেয়েছিলেন তা-ও একস্থানে একত্রিত করে সকল সাহাবীর মাঝে বণ্টন করে দেন।

এই বর্ণনা চলমান রয়েছে। হুদায়বিয়া সংক্রান্ত আরো কিছু বর্ণনা বাকি আছে। কীভাবে হয়েছে, কী হয়েছে, বাকি সবকিছু আগামীতে বর্ণনা করা হবে, ইনশাআল্লাহ্।

এখন আমি কয়েকজন প্রয়াতের স্মৃতিচারণ করব এবং নামাযের পর জানাযা পড়াবো। প্রথম স্মৃতিচারণ হলো স্নেহের শাহরিয়ার রাকিন-এর, যিনি কি-না বাংলাদেশের মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ সাহেবের পুত্র ছিলেন। এ ঘটনা সম্পর্কে লেখা হয়েছে যে, ৫ আগস্ট তারিখে সরকার পতনের পর, বিগত দিনগুলোতে বাংলাদেশে যে ভীষণ নৈরাজ্য ছিল তখন সরকার পতন হলে সারা দেশে অরাজকতা ছড়িয়ে পড়ে এবং আহমদীয়াতের বিরোধীরাও এটিকে কাজে লাগিয়ে আহমদনগর জামা'তের ওপর আক্রমণ করে বসে। এর পূর্বেও এখানে আক্রমণ হয়েছিল। বিরুদ্ধবাদীরা আহমদীদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে যাচ্ছিল এবং মসজিদে আগুন লাগিয়ে জামেয়া ও জলসা গাহের দিকে যায়। তারা যদিও জামেয়াতে প্রবেশ করতে পারে নি, কিন্তু জলসা গাহের পেছন দিক থেকে এসে জলসা গাহের নিরাপত্তার জন্য সেখানে দায়িত্বরত খাদেমদের ঘিরে ফেলে এবং তাদেরকে মারতে থাকে। এরই মাঝে স্নেহের শাহরিয়ার-এর মাথায় প্রচণ্ড আঘাত আসে, যার কারণে তিন মাস চিকিৎসার পর অবশেষে গত ৮ নভেম্বর ষোলো বছর বয়সে তার মৃত্যু হয়, اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ । আর এভাবে সে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করে।

স্নেহের শাহরিয়ার ওয়াকফে নও স্কীমের সদস্য ছিল। উত্তরসূরিদের মাঝে পিতামাতা, দাদা-দাদী ছাড়া এক বোন এবং দুই ভাই রয়েছে। মরহুমের বংশে আহমদীয়াতের প্রবেশ ঘটে তার প্রপিতামহ হযরত মুন্সি সিরাজুল ইসলাম সাহেবের মাধ্যমে যিনি আল্লামা জিল্লুর রহমান সাহেবের মাধ্যমে পরিবারের অধিকাংশ সদস্য-সহ বয়আত করে আহমদীয়া জামা'তের অন্তর্ভুক্ত হন। মরহুম নিজেও জামা'তের একজন কর্মী ছিলেন। আহমদনগরে আতফালুল আহমদীয়ার আমেলায় সেক্রেটারি মাল হিসেবে সেবা করছিলেন।

তাঁর মা লিখেন যে, তার এই ছেলে শুরু থেকেই নামায ও ইবাদতে অনুরাগী এবং জামা'তী কাজে সবচেয়ে বেশি আগ্রহী ছিল। বরং তাকে যদি পড়ালেখার দোহাই দিয়ে জামা'তী কাজে পরে অংশ নেবার কথা বলা হতো তাহলে সে অসন্তুষ্ট হতো। আহমদনগরে যখনই কোনো ইজতেমা বা জলসার উপলক্ষ্য আসত, তখন সে সবার আগে বাড়ি থেকে বের হয়ে সেখানে পৌঁছে যেত। তার মা বলেন, ঘরের ছোটো ছেলে হবার কারণে সে আমার কাজকর্মে খুব সাহায্য করত। রান্নাঘর এবং রান্নার কাজে খুব সহযোগিতা করত। এই ছেলেটি খুবই সামাজিক ছিল, যে-কোনো অপরিচিত ব্যক্তির সাথে খুব সহজে মিশে যেত। তাঁর মা আরো বলেন, সে-ও তার বড়ো ভাইয়ের মতো জামেয়ায় ভর্তির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। তার মা এটিও লিখেছেন যে, পূর্বেই তিনি এরূপ স্বপ্ন দেখেছিলেন যার মাধ্যমে স্নেহের শাহরিয়ারের শাহাদাত সম্পর্কে আগাম সংবাদ দেওয়া হয়েছিল।

খোদ্দামুল আহমদীয়া আহমদনগরের কায়েদ নাজমুস সাকিব সাহেব বলেন, এর পূর্বে ২০২৩ সালের মার্চ মাসে, জলসার সময় হওয়া আক্রমণের ফলে ইঞ্জিনিয়ার জাহিদ হাসান সাহেব শহীদ হয়েছিলেন। (তখন) এখানে আমি তাঁর গায়েবানা জানাযা পড়িয়েছিলাম আর খুতবায় তার স্মৃতিচারণও করেছিলাম। যাহোক, তিনি বলেন, আমরা সবাই ডিউটিতে নাস্তা করার সময় খুতবা শুনছিলাম। তখন স্নেহের শাহরিয়ার রাকিন বলেন, আজ যদি আমি শহীদ হতাম তবে আমারও এরূপ স্মৃতিচারণ হতো। তিনি বিস্তারিত লিখতে গিয়ে বলেন যে, আক্রমণকারীরা যখন ৫ আগস্ট তারিখে হঠাৎ আক্রমণ করে, (অর্থাৎ এবার যে আক্রমণ হয়েছে, অরাজকতার সময়,) তখন জামেয়া পাহারা দেবার জন্য বিপুল সংখ্যক লোক উপস্থিত ছিল। আর রাস্তার অপর পাশে কেবল পনেরোজন খাদেম জলসা গাহের নিরাপত্তার দায়িত্বে দণ্ডায়মান ছিল। শাহরিয়ার তাদের সাথেই এসে যোগ দেয়। অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে পাহারা দিতে থাকে এবং প্রতিরক্ষা কাজে কায়েদ সাহেবকে সাহায্য করতে থাকে। হঠাৎ আক্রমণকারীরা গেট ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে এবং ঢোকার সাথে সাথেই তারা (দায়িত্বরতদের ওপর) চড়াও হয় আর লাঠিসোঁটা দিয়ে প্রহার করতে থাকে। উপস্থিতলোকজনকে মারে এবং অনেককে আহত করে। এতে মরহুম সবচেয়ে বেশি আঘাতপ্রাপ্ত হয়। আর সেই সময় তাঁর মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে। তার সারা দেহ নিস্তেজ হয়ে গিয়েছিল যার বহিঃপ্রকাশ তিনি সেখানেই করেছিলেন। এরপর সেনাবাহিনীর গাড়ি আসে কিছুক্ষণ পর। আর সেনাবাহিনী এসে যাওয়ায় আক্রমণকারীরা আহত আহমদীদের ছেড়ে সেখান থেকে পালিয়ে যায়।

কায়েদ সাহেব আরও লিখেন, (মরহুম) যে-কোনো মুহূর্তে দায়িত্বপালন ও সেবা করতে প্রস্তুত থাকতেন। মসজিদের পরিচ্ছন্নতা ও ওয়াকারে আমলে নিজেও অংশ নিতেন এবং অন্যদেরও সম্পৃক্ত করতেন। ফজর ও তাহাজ্জুদের নামাজে মানুষকে জাগানোর দায়িত্বও পালন করতেন। বাংলাদেশ জামেয়ার শিক্ষার্থী জহির সাহেব বলেন, যেদিন তাঁর দাফন হচ্ছিল সেদিন জলসা গাহ এলাকায় আমার ডিউটি ছিল। আমি আহমদনগরের এক খাদেমকে জিজ্ঞেস করি, আপনারা অধিকাংশ সময় তাঁর সাথে থাকতেন এবং খেলাধুলাও করেছেন। এমন কোন্ বিশেষত্ব ছিল যা তাকে অন্যদের থেকে আলাদা করে। তখন তিনি সে কথাই বলেন যে, ২০২৩ সালের জলসার সময়

শহীদ হওয়া জাহিদ হাসানকে নিয়ে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল এবং আমরা সবাই মিলে সেটি দেখছিলাম। তখন রাকিন হঠাৎ বলতে থাকে যে, হায় আমিও যদি জাহিদ ভাইয়ের মতো শহীদ হতে পারতাম, তবে আমার ছবিও এখানে থাকত এবং খুতবায় আমারও স্মৃতিচারণ হতো। তিনি বলেন, তাঁর একথা শুনে আমরা খুব অবাক হয়েছিলাম। অবশেষে আল্লাহ্ তা'লা তার এ ইচ্ছা পূর্ণ করেছেন।

মরহুমের চাচী রিনাত ফৌযিয়া বলেন, ভাইদের মধ্যে সে সবার ছোটো ছিল এবং সবার কথা মান্য করত। সবার কাজ করে দিত। আর আক্রমণের দিন বাড়ি থেকে যখন বের হচ্ছিল তখন বলছিল, মসজিদের সুরক্ষা করতে হবে, যদি সফল হতে না পারি তাহলে শহীদ হয়ে যাব। মোটকথা শহীদ মরহুম বড়দের জন্যও কুরবানীর এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ স্থাপন করেগেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার মর্যাদা উন্নীত করুন আর তার পিতা-মাতা ও আত্মীয়স্বজনকে ধৈর্য ও মনোবল দান করুন।

দ্বিতীয় গায়েবানা জানাযা পড়াবো আমাদের এক পুরনো আরব বন্ধু কাবাবীরের অধিবাসী আব্দুল্লাহ্ আসাদ উদে সাহেবের, যিনি কিছু দিন পুর্বে ৯৪ বছর বয়সে ইন্তে কাল করেন, اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيۡهِ رَاجِعُوۡنَ।এমন পরিবারে তিনি লালিতপালিত হয়েছেন যে পরিবার কাবাবীরের আহমদী মুবাল্লেগদের সাথে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসা ও নিষ্ঠার সম্পর্ক রাখতো। সে সকল মুবাল্লেগদের আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং দোয়া আর এ সবকিছুর ঊর্ধ্বে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর দোয়ার ফলে কাবাবীর সর্বদা আল্লাহ্ তা'লার সুরক্ষায় এবং নিরাপদ থেকেছে। বিশেষত ফিলিস্তিনের যুদ্ধ এবং ১৯৪৮ সালে বড় পরিসরে অবস্থান পরিবর্তনের সময় আল্লাহ্ তা'লা কাবাবীরকে সুরক্ষিত রেখেছেন। মরহুম হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর যুগ থেকে শুরু করে জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত আহমদীয়াতের খলীফাদের সাথে চিঠিপত্র আদানপ্রদান আর আনুগত্য ও নিষ্ঠাপূর্ণ গভীর সম্পর্ক রেখেছেন। প্রারম্ভিক মূসীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ১৯৩৪ সালে হযরত মওলানা আবুল আতা জলন্ধরী সাহেব আহমদীয়া স্কুল চালু করলে সেখানে মরহুম প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন। এরপর ১৯৪৮ সালে ইংরেজী স্কুলে ভর্তি হন এবং সেখান থেকে মেট্রিক পাশ করেন। এরপর আল-কুদ্স্ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উত্তম ফলাফলসহ এম. এ. ডিগ্রি অর্জন করেন। বিশ বছর যাবৎ শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে কাজ করেন। এরপর রাষ্ট্রীয় অডিট বিভাগে এক বড় পদে থেকে কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করেন। ১৯৯৫ সালে সেখান থেকে অবসরে যান। অবসর গ্রহণের পর ধর্ম মন্ত্রণালয়ে ইসলাম বিষয়ক প্রধান হিসেবে তার নাম প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু তিনি আহমদী হওয়ার কারণে কতিপয় মুসলিম অধ্যুষিত দেশ তার বিরোধিতা করে। তখন তিনি নিজ নীতি ও আদর্শ এবং আহমদীয়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে তা থেকে হাত গুটিয়ে নেন।

১৯৪৫ সালে হযরত চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খান সাহেব জাতিসংঘের প্রতিনিধি হিসেবে ফিলিস্তিন সফর করেন এবং সেই সফরে তিনি মিশন হাউজেও আসেন আর মরহুম আবু সালাহ মুহাম্মদ সালেহ উদে, যিনি শরীফ উদে-র দাদা ছিলেন, তার বাড়িতে অবস্থান করেন। সে সময় মরহুম আব্দুল্লাহ্ আসাদ সাহেব ১৫ বছরের যুবক ছিলেন। তিনি প্রতিদিন চৌধুরী সাহেবের সেবার নিমিত্তে আসতেন এবং তাকে পত্রপত্রিকা ইত্যাদিও সরবরাহ করতেন।

মরহুম সর্বদা মুবাল্লেগদের একান্ত সান্নিধ্যে থেকেছেন এবং জেনারেল সেক্রেটারি, সেক্রেটারি তা'লীম ও তরবিয়্যত, সেক্রেটারি উমুরে খারেজা, সদর মজলিসে আনসারুল্লাহ্ এবং শতবর্ষ জুবিলি উদ্‌যাপন কমিটির সেক্রেটারি পদে জামা'তের সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন।

কাবাবীরে নব-নির্মিত মাদরাসায়ে আহমদীয়ার মহান কর্মযজ্ঞে মুবাল্লেগ সিলসিলাহ জনাব জালালুদ্দীন ক্বমর সাহেব মরহুমের সহায়ক ও সাহায্যকারী ছিলেন। তিনি উচ্চমার্গের একজন লেখক ছিলেন। আরবী পত্রিকা 'আল-বুশরা'তে সত্তর বছর পর্যন্ত বহু প্রবন্ধ লিখেছেন। তিনি সূরা কাহাফের তফসীর ইংরেজী থেকে আরবীতে অনুবাদও করেছেন যেটি মুবাল্লেগ সিলসিলাহ মুকাররম ফযলে ইলাহী বশীর সাহেবের যুগে জামা'তে মুদ্রিত হয়েছে।

আরব দেশসমূহে জামা'ত বিরোধী প্রোপাগান্ডা হচ্ছিল যে, জামা'তে আহমদীয়া এবং বাহাইয়্যাত একই মুদ্রার দু'পিঠ। [এতে জামা'তকে বাহাইদের সাথে মেলানো হয়েছে।] আব্দুল্লাহ্ আসাদ সাহেব এর দাঁতভাঙা জবাব দিতে গিয়ে আরবী ভাষায় "আল-মুআমেরাতুল কুবরা" শিরোনামে একটি পুস্তক প্রণয়ন করেন। অনুরূপভাবে তিনি আহমদীয়া জামা'ত, কাবাবীরের ইতিহাস বিষয়ে 'আল কাবাবীর বালাদী' অর্থাৎ 'আমার শহর কাবাবীর' শীর্ষক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান, আত্মাভিমানী, আহমদীয়াত ও জামা'ত সম্পর্কিত প্রতিটি বিষয়ে গর্বিত জামা'তের একজন প্রকৃত সেবক। তিনি সংসদ সদস্য হওয়ার প্রস্তাবও লাভ করেন, কিন্তু তিনি তা এই বলে ফিরিয়ে দেন যে, রাষ্ট্রের নিজস্ব একটি নীতিমালা থাকে অথচ আমার নীতি হলো-আহমদীয়াত। মরহুমের ছেলে খালেদ আব্দুল্লাহ্ বলেন, কখনো কখনো আমার বাবা জামা'তের কাজে ব্যস্ত থাকলে আমার মা একসাথে চা পান করতে অথবা বাইরে যেতে বললে তিনি জবাবে বলতেন, আমার কাছে জামা'তের গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে। সেটি শেষ করেই অন্য কাজে মনোযোগ দিবো। জামা'তের দায়িত্ব সর্বাগ্রে। শোকসন্তপ্ত পরিবারে তিন ছেলে, তিন মেয়ে এবং চৌদ্দজন পৌত্র-পৌত্রি রয়েছে।আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের প্রতি ক্ষমা ও দয়াসুলভ ব্যবহার করুন। তাঁর মর্যাদা উন্নত করুন এবং তার পরবর্তী প্রজন্মকেও তাঁর পদাঙ্কে পরিচালিত হওয়ার তৌফিক দান করুন।

যেমনটি আমি বলেছি, নামাযের পরে আমি উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গের গায়েবানা জানাযা পড়াব।

❁****❁****❁****❁

(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২২ শে নভেম্বর, ২০২৪)

পরিতাপ! যে কাজ করার সাহস মক্কার মুশরেকদেরও হয় নি, সেই কাজ মুসলমানেরা দুঃসাহসিকতার সঙ্গে করেছে, তারা ভেবে দেখে নি যে এই অযৌক্তিক দাবিকে কে স্বীকার করবে?

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা রাআদ এর ১৭নং আয়াত এর ব্যাখ্যায় বলেন:

খোদা তা'লার কি বিচিত্র মহিমা! যে সব ব্যক্তিকে পৃথিবীর মানুষ খোদার স্থানে বসিয়েছে, তাদের জীবন দুঃখ-কষ্টেই কেটেছে। হযরত মসীহকে দেশান্তরিত হতে হয়েছে,বিভিন্ন দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়েছে। হযরত হোসেন (রা.)-কে তো শহীদ করে দেওয়া হয়েছে।শ্রী রামচন্দ্রও কষ্টে দিন কাটিয়েছেন। ***'লা ইয়ামলিকুনা লি আনাফুসিহিম'***এ বলা হয়েছে যে, যখন তারা নিজেদের প্রাণও রক্ষা করতে পারে নি, তখন তারা তোমাদের উপকার কিভাবে করবে? هَلۡ يَسۡتَوِى الۡاَعۡمٰى وَالۡبَصِيۡرُ -অন্ধ ও চাক্ষুষমান ব্যক্তি কি সমান হতে পারে? অর্থাৎ তোমরা নিজেদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে গর্ব কর, কিন্তু চিন্তা করে দেখ! সব সময়ই কি এই সংখ্যাধিক্য কাজে লাগে? বহু সংখ্যক চক্ষুহীন ব্যক্তিদের সমাবেশ শক্তি না কি দুর্বলতার কারণ হয়? একজন চাক্ষুষমান ব্যক্তি এক হাজার অন্ধ ব্যক্তির উপর জয়ী হয়। অনুরূপভাবে এই নবী এবং তাঁর অনুসারীগণ খোদার পক্ষ থেকে জ্ঞান প্রাপ্ত হয়, খোদার ওহী তাদেরকে তোমাদের পরিকল্পনা এবং ষড়যন্ত্র সম্পর্কে পূর্বাহ্নেই সতর্ক করে দেয়। কাজেই এটিই চাক্ষুষমান ব্যক্তির উপমা, কিন্তু তোমরা জান না যে তাঁর পক্ষ থেকে কোন পরিকল্পনা তৈরী হচ্ছে? কেননা তাঁর সমর্থনে অধিকাংশ চেষ্টা সংঘটিত হচ্ছে খোদা তা'লার পক্ষ থেকে প্রকৃতির নিয়মের সুপ্ত প্রভাবের মাধ্যমে, যা সম্পর্কে তোমরা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। কাজেই ভেবে দেখ যে তোমরা তার এবং তার সঙ্গীদের কিভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পার? এরা অল্প, কিন্তু এদের চোখ আছে।

هَلۡ تَسۡتَوِى الظُّلُمٰتُ وَالنُّوۡرُ অনুরূপভাবে বলা হয়েছে যে আলো ও অন্ধকারেরও কোন তুলনা হয় না। সামান্য আলো সমগ্র ঘরের অন্ধকার মুছে ফেলে। অন্ধকারের অর্থ আলোকহীনতা আর আলো হল অস্তিত্ব। অস্তিত্বের সামনে অনস্তিত্ব কি-ই বা মূল্য রাখে? অর্থাৎ-তোমাদের কাছে ঐশী শিক্ষা নেই, কিন্তু তাদের কাছে আছে। কাজেই তোমাদের সঙ্গে তাদের তুলনা চলে না। তার শিক্ষার ভিত্তি হল সত্য আর তোমাদের শিক্ষার ভিত্তি হল অজ্ঞতা এবং অস্বীকার।

اَمۡ جَعَلُوۡا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ خَلَقُوۡا كَخَلۡقِهٖ فَتَشَابَهَ الۡخَلۡقُ عَلَيۡهِمۡ-

এটি মুশরেকিনদের সামনে আপত্তি হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। অর্থাৎ- তোমরা মুশরিক হওয়া সত্ত্বেও একথা বলার ধৃষ্টতা দেখাতে পারবে না যে মিথ্যা উপাস্যরা কোন কিছু সৃষ্টি করেছে আর তা খোদার সৃষ্টির সঙ্গে সদৃশপূর্ণ। কেননা মক্কার মুশরিকা একথা বলার সাহস পায় নি। যদি অন্যান্য কিছু দেশের মুশরিকরা নিজেদের উপাস্য সম্পর্কে এমন সব দাবিও তুলে ধরে। পরিতাপের বিষয়, বর্তমান যুগে মুসলমানেরাও একথা বলতে শুরু করেছে। আর হযরত মসীহকে পক্ষীর সৃষ্টিকর্তা হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। এমনকি অনেকে একথা পর্যন্ত বলেছে যে, আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টি করা পাখি আর হযরত মসীহ্র দ্বারা সৃষ্ট পাখির মধ্যে এখন আর পার্থক্য করা যায় না।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলতেন, 'আমি জনৈক মৌলবীকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমরা যে দাবি কর যে হযরত মসীহ নাসেরী পাখি সৃষ্টি করতেন-তো তিনি কোন পাখি সৃষ্টি করতেন? মৌলবী উত্তর দিল, বাদুড়। আমি যখন জিজ্ঞাসা করলাম ঈসা (আ.)-এর সৃষ্টি করা বাদুড় কোনগুলি আর খোদা তা'লার সৃষ্টি করা কোনগুলি, তখন মৌলবীরা উত্তর দিল, 'এখন তা জানা যায় না' তারা পাঞ্জাবি ভাষায় বলল এখন তো সেগুলি খোদা তা'লার সৃষ্টি করা বাদুড়দের সঙ্গে মিশে গেছে।

পরিতাপ! যে কাজ করার সাহস মক্কার মুশরেকদেরও হয় নি, সেই কাজ মুসলমানেরা দুঃসাহসিকতার সঙ্গে করেছে, তারা ভেবে দেখে নি যে এই অযৌক্তিক দাবিকে কে স্বীকার করবে?

(তফসীর কবীর, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪০২)

❖****❖****❖****❖

জুমআর খুতবা

উরওয়া কুরাইশের কাছে যায় আর বলে, হে আমার গোত্রের লোকেরা! আমি দুতিয়ালির জন্য বাদশাহ্‌দের দরবারে, রাজপ্রাসাদে তথা রোম সম্রাট, পারস্য সম্রাট ও নাজ্জাশী-র রাজ দরবারে গিয়েছি। আল্লাহ্‌র কসম, আমি কখনো এমন কোনো বাদশাহ্ দেখি নি যার এরূপ আনুগত্য করা হয় যেমনটি মুহাম্মদ (সা.) -এর আনুগত্য তাঁর সাহাবীরা করে থাকে।

মহানবী (সা.) বলেন, আমরা যুদ্ধের উদ্দেশ্যে আসি নি, বরং শুধুমাত্র উমরার উদ্দেশ্যে এসেছি। .... আমি তো তাদের সাথে এ বিষয়ে আপস করতেও প্রস্তুত যে, তারা আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধ করে আমাকে ছেড়ে দিক। কিন্তু তারা যদি আমার এই প্রস্তাবকেও প্রত্যাখ্যান করে আর যে-কোনো মূল্যে যুদ্ধের আগুন প্রজ্বলিত করে রাখে সেক্ষেত্রে আমিও সেই সত্তার কসম খেয়ে বলছি যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তাহলে আমিও এই মোকাবিলা থেকে ততক্ষণ পর্যন্ত পিছু হটব না যতক্ষণ না এ পথে খোদা আমাকে বিজয় দান করেন বা আমি নিহত হই।

হযরত আবু বকর (রা.) যিনি মহানবী (সা.)-এর পেছনে বসে ছিলেন, তিনি রাগান্বিত হয়ে বলেন, নিজেদের প্রতিমা 'লাত'কে চুম্বন করতে থাকো, অর্থাৎ তার পূজা করো; আমাদের সাথে এমন কথা বলবে না। আমরা কি মুহাম্মদ (সা.)-কে পরিত্যাগ করব?

মহানবী (সা.) তৎক্ষণাৎ ঘোষণা দিয়ে সমস্ত মুসলমানদের একটি বাবলা গাছের নিচে একত্রিত করলেন। যখন সাহাবীরা একত্রিত হয়ে গেলেন তখন মহানবী (সা.) এই সংবাদের উল্লেখ করে বলেন, যদি এ খবর সত্য হয় তাহলে খোদার কসম! উসমানের (রা.) প্রতিশোধ না নেওয়া পর্যন্ত আমরা এই স্থান পরিত্যাগ করব না। অতঃপর তিনি (সা.) সাহাবীদের উদ্দেশ্য করে বলেন, আসো, তোমরা আমার হাতের ওপর হাত রেখে, ইসলামে বয়আত গ্রহণের রীতি অনুসারে, এই প্রতিজ্ঞা করো যে, তোমাদের কেউ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না। নিজ জীবন বাজি রেখে হলেও কোনো অবস্থাতেই নিজেদের (যুদ্ধের) স্থান পরিত্যাগ করবে না।"

এ ঘোষণার পর সাহাবীরা বয়আতের জন্য এমনভাবে এগিয়ে এলেন যে, একজন আরেকজনের ওপর দিয়ে ঝাঁপ দিচ্ছিলেন। তখন সর্বসাকুল্য সেই চৌদ্দ-পনেরো'শ মুসলমানের এক এক ব্যক্তি যেন নিজেদের প্রিয় প্রভুর সামনে দ্বিতীয়-বারের মতো নিজেদের বিক্রি করে দিলেন।

যখন বয়আত নেওয়া হচ্ছিল মহানবী (সা.) তখন তাঁর বাম হাত ডান হাতের ওপর রেখে বললেন, এটি উসমানের হাত, কেননা সে যদি এখানে উপস্থিত থাকতো তাহলে এই পবিত্র ব্যাবসায় কারোর চেয়ে পিছিয়ে থাকতো না। কিন্তু এই মুহূর্তে তিনি খোদা এবং তাঁর রসূলের কাজে ব্যস্ত।"

খোদার কৃপায় মুসলমানরা নিজ নিজ অবস্থানে সতর্ক ছিল। একসময় কুরাইশের এই ষড়যন্ত্রের পর্দা ফাঁস হয়ে যায় আর এদের সকলকে গ্রেফতার করা হয়। পবিত্র মাসে হেরেমের এলাকায় মক্কাবাসীদের এমন আচরণে মুসলমানরা ভীষণ ক্ষুব্ধ হন, কিন্তু মহানবী (সা.) তাদেরকে ক্ষমা করে দেন আর মীমাংসার প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে কোনোরূপ বাধা সৃষ্টি হতে দেন নি।"

অঙ্গীকারের এই বয়আত এজন্য ছিল যে, প্রত্যেক মুসলমান ইসলামের জন্য এবং ইসলামের সম্মানের খাতিরে নিজেদের জীবন বাজি রাখবে, কিন্তু তারা পিছপা হবে না। এই বয়আতের বিশেষ আরেকটি দিক এটিও ছিল যে, এ অঙ্গীকার মুখের কোনো সাময়িক স্বীকারোক্তি ছিল না যা আবেগের বশবতী হয়ে করা হয়েছে, বরং হৃদয়ের গভীর থেকে উৎসারিত একটি ধ্বনি ছিল যার পেছনে মুসলমানদের সমস্ত শক্তি এক বিন্দুতে জড়ো হয়েছিল।"

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ২২ নভেম্বর, ২০২৪, এর জুমুআর খুতবা (২২ নবুয়ত, ১৪০৩ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

اَشۡهَدُ اَنۡ لَّاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحۡدَهٗ لَا شَرِيۡكَ لَهٗ وَاَشۡهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبۡدُهٗ وَرَسُوۡلُهٗ
اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيۡطٰنِ الرَّجِيۡمِ - بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ -
اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ - الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ - مٰلِكِ يَوۡمِ الدِّيۡنِ - اِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَاِيَّاكَ نَسۡتَعِيۡنُ -
اِهۡدِنَا الصِّرَاطَ الۡمُسۡتَقِيۡمَ - صِرَاطَ الَّذِيۡنَ اَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ ۙ غَيۡرِ الۡمَغۡضُوۡبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا الضَّآلِّيۡنَ -

তাশাহ্‌হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, হুদাইবিয়ার (সন্ধি) সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছে। এ সম্পর্কে বুদাইল বিন ওয়ারকা খুযাঈ এবং অন্যান্য কুরাইশ প্রতিনিধিদের মহানবী (সা.)-এর সমীপে আগমনেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এর বিশদ বিবরণ এভাবে দিয়েছেন, মহানবী (সা.) হুদাইবিয়ার উপত্যকায় পেঁ ৗছে সেখানকার এক ঝরনার পাশে শিবির স্থাপন করেন। সাহাবীরা সেখানে শিবির স্থাপনের পর খুযাআ গোত্রের বুদাইল বিন ও য়ারকা নামক এক প্রসিদ্ধ নেতা যে পার্শ্ববর্তী এলাকায়ই বসবাস করতো, তার কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে মহানবী (সা.)-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য আসে এবং সে তাঁর (সা.) সমীপে নিবেদন করে, মক্কার নেতারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত রয়েছে আর তারা কখনোই আপনাকে মক্কায় প্রবেশ করতে দিবে না।

মহানবী (সা.) বলেন, আমরা যুদ্ধের উদ্দেশ্যে আসি নি, বরং শুধুমাত্র উমরার উদ্দেশ্যে এসেছি। আর পরিতাপের বিষয় হলো, যুদ্ধের আগুন মক্কার কুরাইশদের জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্মীভূত করা সত্ত্বেও তারা এথেকে বিরত হচ্ছে না। অথচ আমি তো তাদের সাথে এ বিষয়ে আপস করতেও প্রস্তুত যে, তারা আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধ করে আমাকে ছেড়ে দিক। কিন্তু

তারা যদি আমার এই প্রস্তাবকেও প্রত্যাখ্যান করে আর যে-কোনো মূল্যে যুদ্ধের আগুন প্রজ্বলিত করে রাখে সেক্ষেত্রে আমিও সেই সত্তার কসম খেয়ে বলছি যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তাহলে আমিও এই মোকাবিলা থেকে ততক্ষণ পর্যন্ত পিছু হটব না যতক্ষণ না এ পথে খোদা আমাকে বিজয় দান করেন বা আমি নিহত হই।”

আমি যদি তাদের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ধ্বংস হই তাহলে কাহিনীর যবনিকাপাত ঘটলো, কিন্তু খোদা যদি আমাকে বিজয় দান করেন এবং আমার আনীত ধর্ম বিজয় লাভ করে তাহলে মক্কাবাসীদেরও (আমার প্রতি) ঈমান আনতে দ্বিধা করা উচিত হবে না। বুদাইল বিন ওয়ারকা-এর ওপর মহানবী (সা.)-এর এই নিষ্ঠাপূর্ণ এবং বেদনাঘন বক্তব্যের গভীর প্রভাব পড়ে আর সে তাঁর কাছে নিবেদন করে, আপনি আমাকে একটু সুযোগ দিন, যেন মক্কায় গিয়ে আমি আপনার বার্তা পৌঁছাতে পারি এবং সন্ধির চেষ্টা করতে পারি। মহানবী (সা.) অনুমতি প্রদান করেন এবং বুদাইল স্বজাতির কয়েকজন লোককে সাথে নিয়ে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করে। বুদাইল বিন ওয়ারকা মক্কায় পৌঁছে কুরাইশকে জড়ো করে তাদের বলে, আমি তো ঐ ব্যক্তি অর্থাৎ, মুহাম্মদ [মহানবী (সা.)]-এর কাছ থেকে আসছি আর আমার সামনে তিনি একটি প্রস্তাব রেখেছেন; আপনারা অনুমতি দিলে আমি শোনাতে চাই। তখন কুরাইশের উত্তেজিত ও দায়িত্বজ্ঞানহীন লোকেরা বলতে আরম্ভ করে, আমরা এই লোকের কোনো কথা শুনতে প্রস্তুত নই! [অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর কোনো কথা শুনতে চাই না।] কিন্তু বিচক্ষণ ও নির্ভরযোগ্য লোকজন বলে, ঠিক আছে, সে যে প্রস্তাবই দিয়েছে তা আমাদেরকে বলো। অতএব বুদাইল মহানবী (সা.)-এর প্রস্তাব তাদের সামনে তুলে ধরে। তখন উরওয়া বিন মাসঊদ নামক সাকীফ গোত্রের একজন প্রভাবশালী নেতা, যে সে সময় মক্কায় উপস্থিত ছিল, সে দণ্ডায়মান হয় এবং প্রাচীন আরবী রীতি অনুযায়ী কুরাইশদের বলতে আরম্ভ করে, হে লোকেরা! আমি কি তোমাদের পিতৃতুল্য নই? তারা বলে, অবশ্যই। এরপর সে বলে, তোমরা কি আমার পুত্রতুল্য নও? তারা বলে, অবশ্যই; আমরাও আপনার পুত্রতুল্য। এরপর উরওয়া বলে, আমার প্রতি কি তোমাদের কোনো আস্থার ঘাটতি আছে? কুরাইশরা বলে, একদমই না। অতঃপর সে বলে, তাহলে আমার পরামর্শ হলো, এই ব্যক্তি অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা.) তোমাদের সামনে একটি উত্তম প্রস্তাব উপস্থাপন করেছেন। তোমাদের এই প্রস্তাব গ্রহণ করা উচিত আর আমাকে অনুমতি দাও, যেন আমি তোমাদের পক্ষ থেকে মুহাম্মদ (সা.)-এর নিকট গিয়ে আলোচনা অব্যাহত রাখতে পারি। কুরাইশরা বলে, ঠিক আছে, আপনি যান এবং আলোচনা করুন।”

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৭৫৫-৭৫৬)

এর বিশদ বিবরণে লেখা আছে, মহানবী (সা.)-এর সমীপে উরওয়া আসে এবং বলতে আরম্ভ করে, ‘হে মুহাম্মদ (সা.)! আমি কা’ব বিন লুয়ী এবং আমের বিন লুয়ীকে হুদাইবিয়ার ঝরনার কাছে রেখে এসেছি। তাদের সাথে দুগ্ধবতী কিছু উটনীও রয়েছে। তারা কুরাইশের মিত্র গোত্র আহাবীশ-কে এবং তাদের অনুসারীদের আহ্বান করেছে। (এই গোত্র হাবশী নামক পর্বতের পাদদেশে শপথ নিয়েছিল, তাই তাদেরকে আহাবীশ বলা হতো)। সে বলে, ‘আর তারা চিতা বাঘের চামড়া পরিধান করে আছে; [অর্থাৎ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে।] আর তারা এই শপথ করে রেখেছে যে, তারা বায়তুল্লাহ্ এবং আপনার মধ্যকার রাস্তা পরিত্যাগ করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনি তাদের হত্যা করেন [অর্থাৎ মহানবী (সা.) তাদেরকে ধ্বংস না করেন।] সে (অর্থাৎ উরওয়া) বলতে থাকে, নিঃসন্দেহে আপনি এবং যাদের সাথে আপনি যুদ্ধ করবেন তাদের মধ্যে দুটি বিষয়ের মধ্যে একটি নিশ্চিত ঘটবে; [মহানবী (সা.)-কে বলছে,] হয়ত আপনি আপনার জাতিকে ধ্বংস করবেন আর আজ পর্যন্ত এমনটি শোনা যায় নি যে, কোনো ব্যক্তি তার স্বজাতিকে এবং তার পরিবারের লোকদেরকে ধ্বংস করেছে। অথবা আপনার সঙ্গীসাথি যারা আপনার সাথে রয়েছে- তারা আপনাকে লাঞ্ছিত করবে। অর্থাৎ সে মহানবী(সা.)-কে এভাবেও ভয় দেখানোর চেষ্টা করে যে, আপনার সাথে যারা আছে তারা তো ভীতু। সে বলে, খোদার কসম! আপনার সাথে আমি যেসব চেহারা দেখছি সেগুলো কেবল পলায়নকারীদের চেহারা। (সে সাহাবীদের সম্পর্কে অনেক কুধারণা পোষণ করে।) অপর একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে, এই লোকদের মধ্যে সেসব মানুষও আছে যাদের চেহারা আমি চিনি না আর তাদের বংশ পরিচয় এবং চরিত্রও আমার জানা নেই। আমি মনে করি, তারা আপনাকে ফেলে পালিয়ে যাবে। এছাড়া অপর আরেকটি রেওয়ায়েতে এসেছে, (সে এ কথাও বলেছিল,) আমি দেখছি, আপনি যদি কুরাইশের সাথে যুদ্ধ করেন তাহলে এরা আপনাকে কুরাইশের হাতে তুলে দেবে। [এভাবে সে মুহাম্মদ (সা.)-কে প্রভাবিত করার বা ভয় দেখানোর চেষ্টা করে।] আর তারা আপনাকে বন্দি করবে; তাহলে এর চেয়ে কষ্টদায়ক বিষয় আর কী হতে পারে? তখন হযরত আবু বকর (রা.) যিনি মহানবী (সা.)-এর পেছনে বসে ছিলেন, তিনি রাগান্বিত হয়ে বলেন, নিজেদের প্রতিমা ‘লাত’কে চুম্বন করতে থাকো, অর্থাৎ তার পূজা করো; আমাদের সাথে এমন কথা বলবে না। আমরা কি মুহাম্মদ (সা.)-কে পরিত্যাগ করব?

(একথা শুনে) উরওয়া বলে, ইনি কে? তারা উত্তরে বলে, ইনি হচ্ছেন আবু বকর। তখন উরওয়া বলে, ‘আল্লাহ্‌র কসম! আমার প্রতি যদি তোমার একটি অনুগ্রহ না থাকতো তাহলে আমি অবশ্যই এর উত্তর দিতাম’। কোনো সময় উরওয়ার প্রতি হযরত আবু বকর (রা.) একটি অনুগ্রহও করেছিলেন। আর এ সম্পর্কে লেখা আছে, কোনো এক সময় উরওয়া রক্তপণ পরিশোধ করার জন্য সহযোগিতা কামনা করে। (কাউকে হত্যা করেছিল, এর রক্তপণ পরিশোধ করার ছিল।) সহযোগিতা চাইলে কেউ দুটি আবার কেউ তিনটি উট দিয়ে তাকে সাহায্য করে, কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.) দশটি উট দিয়ে (তাকে) সাহায্য করেছিলেন।

এরপর উরওয়া মহানবী (সা.)-এর সাথে কথা বলতে থাকে আর কথা বলার সময় মহানবী (সা.)-এর দাড়ি স্পর্শ করছিল। হযরত মুগীরা বিন শো’বা মহানবী (সা.)-এর পাশে শিরস্ত্রাণ পরিহিত অবস্থায় তরবারি হাতে দাঁড়িয়ে ছিলেন। উরওয়া যখন কথা বলার জন্য সামনে অগ্রসর হয় এবং তাঁর পবিত্র দাড়ি স্পর্শ করার জন্য নিজের হাত সামনে বাড়ায় তখন হযরত মুগীরা তার তরবারির প্রান্ত দিয়ে তাকে সরিয়ে দেন এবং বলেন, তরবারির আঘাত খেতে না চাইলে মহানবী (সা.)-এর দাড়ি স্পর্শ করা হতে তোমার হাতকে বিরত রাখো। কেননা কোনো মুশরিকের জন্য সমীচীন নয় যে, সে তাঁর (সা.) দাড়ি স্পর্শ করবে। উরওয়া নিজের মাথা উঠিয়ে জিজ্ঞেস করে, এই ব্যক্তি কে? মানুষ বলে, মুগীরা বিন শো’বা। এক রেওয়ায়েতে এটিও বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) বলেন, এ হলো তোমার ভাতিজা মুগীরা বিন শো’বা। সে বলে, হে অঙ্গীকার ভঙ্গকারী! অর্থাৎ মুগীরা বিন শো’বা-কে উরওয়া বলে, আমি কি তোমার অঙ্গীকার ভঙ্গের সংশোধনের চেষ্টা করি নি? এর বিস্তারিত বিবরণ হলো, সে যে বিষয়ের বরাত টানছে তা হলো, হযরত মুগীরা অজ্ঞতার যুগে কতিপয় লোকের সাথে যান এবং তিনি কিছু লোককে হত্যা করে তাদের সম্পদ হস্তগত করেন আর এরপর এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন মহানবী (সা.) বলেন, ইসলামের যতটুকু সম্পর্ক রয়েছে, তা আমি গ্রহণ করছি। আর সম্পদের যতটুকু সম্পর্ক রয়েছে, সেটির সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। এটি বুখারীর রেওয়ায়েত। কিন্তু যাহোক, উরওয়া এই বিষয়ে তার কোনো সাহায্য করে থাকবে। এরপর উরওয়া মহানবী (সা.)-এর সাহাবীদের মনোযোগের সাথে দেখতে থাকে। যখনই মহানবী (সা.) থুতু ফেলতেন সাহাবীরা তা নিজেদের হাতে নিয়ে নিতেন আর এরপর তা নিজেদের চেহারায় ও বুকে মালিশ করতেন। যখন তিনি সাহাবীদের কোনো কিছুর নির্দেশ দিতেন তখন সাহাবীরা তাৎক্ষণিকভাবে তা পালন করতেন। তিনি (সা.) যখন ওযু করতেন তখন সাহাবীরা ওযুর পানি নেবার জন্য প্রতিযোগগিতা আরম্ভ করতেন। কোনো একটি চুলও নিচে পড়তে দিতেন না, বরং সেটিকে সংরক্ষণ করতেন। আর তাঁর (সা.) সামনে নিজেদের আওয়াজ নীচু রাখতেন। আর তাঁর সম্মানের কারণে তাঁর প্রতি বাঁকা চোখে তাকাতেন না। অর্থাৎ চোখ তুলে দেখতেন না। উরওয়া যখন আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর সাথে কথা বলা শেষ করে তখন তিনি (সা.) উরওয়াকেও সেই একই কথা বলেন যা বুদায়েল বিন ওয়ারকাকে বলেছিলেন। আর দীর্ঘক্ষণ সন্ধির প্রস্তাব উপস্থাপন করতে থাকেন।

অতঃপর উরওয়া কুরাইশের কাছে যায় আর বলে, হে আমার গোত্রের লোকেরা! আমি দুতিয়ালির জন্য বাদশাহ্‌দের দরবারে, রাজপ্রাসাদে তথা রোম সম্রাট, পারস্য সম্রাট ও নাজ্জাশী-র রাজ দরবারে গিয়েছি। আল্লাহ্‌র কসম, আমি কখনো এমন কোনো বাদশাহ্ দেখি নি যার এরূপ আনুগত্য করা হয় যেমনটি মুহাম্মদ (সা.) -এর আনুগত্য তাঁর সাহাবীরা করে থাকে।

কোথায় সে এসেছিল মহানবী (সা.)-কে কাফিরদের ভয় দেখানোর জন্য, আর কোথায় সে এসব দৃশ্য দেখে প্রভাবিত হয়ে যায় আর এই কথাই সে ফিরে গিয়ে কাফিরদেরও অবগত করে। সে বলে, আল্লাহ্‌র কসম, আমি এমন কোনো বাদশাহ্ দেখি নি যার সাথিরা তার ততটা সম্মান করে যতটা মুহাম্মদ (সা.)-এর সাহাবীরা মুহাম্মদ (সা.)-এর সম্মান করে। আল্লাহ্‌র কসম, তাঁর মতো আর কোনো বাদশাহ্ নেই। তিনি যখন থুতু ফেলেন তখন তাঁর সঙ্গীরা তা নিজেদের হাতে নিয়ে নেয়। এরপর সেটিকে নিজেদের মুখে ও বুকে মালিশ করে। এছাড়া যখন তিনি (সা.) কোনো নির্দেশ দেন তখন সেটিকে দ্রুত পালন করেন। তিনি যখন ওযু করেন তখন ওযুর পানি নেওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা আরম্ভ করে দেয়। আর তাঁর চুল পর্যন্ত নিচে পড়তে দেয় না, বরং সেটিকে সংরক্ষণ করে নেয়। তাঁর সামনে তাঁর সঙ্গীরা নীচু স্বরে কথা বলে আর সম্মানার্থে তাঁর প্রতি সরাসরি তাকায় না। আর

কোনো এক ব্যক্তিও অনুমতি ব্যতিরেকে কথা বলে না। যখন তিনি অনুমতি দেন, অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর অনুমতি থাকে, তখনই সাহাবীরা কথা বলে। আর তিনি যদি অনুমতি না দেন তাহলে সবাই চুপ থাকে। সে বলে, তিনি তোমাদের কাছে একটি ভালো প্রস্তাব উপস্থাপন করেছেন। অর্থাৎ মহানবী (সা.) একটি উত্তম প্রস্তাব উপস্থাপন করেছেন, অতএব তা গ্রহণ করে নাও। সে বলে, নিঃসন্দেহে আমি আমার জাতিকে সতর্ক করেছি। আর তোমরা ভালোভাবে জেনে নাও যে, যদি তোমরা তাঁর ওপর তরবারি চালানোর সংকল্প করো তাহলে তারাও তোমাদের বিরুদ্ধে তরবারি চালনা করবে। তোমরা যদি তাদের নেতাকে বাধা দাও, অর্থাৎ মহানবী (সা.)-কে বাধা দাও, সে ক্ষেত্রে আমি এই জাতিকে দেখেছি যে, তারা মোটেই এর কোনো পরোয়া করবে না যে, তাদের সাথে কী হবে। আল্লাহ্‌র কসম, আমি তাঁর সাথে এমন নারীদেরও দেখেছি যারা তাঁকে আমাদের হাতে তুলে দেবে না। হে আমার জাতির লোকেরা! নিজেদের মত পরিবর্তন করো। তোমরা তাঁর কাছে যাও এবং তোমরা সেই প্রস্তাব মেনে নাও যা তিনি তোমাদের সামনে উপস্থাপন করেন। অর্থাৎ মহানবী (সা.) যে সন্ধির প্রস্তাব দিয়েছেন বা উমরা করার কথা বলেছেন- সেটি মেনে নাও। সে বলে, আমি তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী। একইসাথে আমার এই আশঙ্কাও রয়েছে যে, সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করা হবে না যে বায়তুল্লাহ্ যিয়ারতের জন্য এসেছে। তাঁর কাছে কুরবানীর পশু রয়েছে যেগুলো তিনি জবাই করবেন এবং এরপর ফিরে যাবেন। তখন কুরাইশরা উরওয়াকে বলে, হে আবু ইয়াফুর! এরূপ কথা বলো না। তুমি ছাড়া আর কোনো ব্যক্তিও কি এরূপ কথা বলেছে? এর বিপরীতে আমরা তাদের এ বছর ফিরে যেতে বাধ্য করবো আর তারা আগামী বছর আসতে পারে। তখন উরওয়া বলে, তোমাদের কঠিন বিপদের সম্মুখীন হতে হবে। এরপর উরওয়া ও তার সাথিরা তায়েফের দিকে চলে যায়।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৪৪-৪৫) (বুখারী কিতাবুশ শরুত, হাদীস-২৭৩১-২৭৩২) (সীরাত এসাইক্লোপেডিয়া, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৯৩) (মুসনাদ আহমদ জামে, খণ্ড-১১ ,পৃ: ২০৭)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-ও হুদাইবিয়ার সন্ধির ঘটনাবলি বর্ণনা করেছেন। এ সম্পর্কে লিখতে গিয়ে তিনি বলেন, মহানবী (সা.) যখন কা'বা শরীফ তাওয়াফ করার জন্য যান তখন মক্কার কাফিররা সংবাদ পেয়ে নিজেদের একজন নেতাকে তাঁর (সা.) কাছে প্রেরণ করে যেন সে গিয়ে বলে যে, এ বছর আপনি তাওয়াফ করার জন্য আসবেন না। সেই নেতা তাঁর (সা.) কাছে যায় এবং কথা বলা আরম্ভ করে। কথা বলার সময় সে তাঁর পবিত্র শ্মশ্রুতে হাত লাগায় আর বলে, আপনি এ বছর তাওয়াফ করবেন না এবং আগামী কোনো বছর পর্যন্ত এটিকে স্থগিত করে দিন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এই হাত দেওয়া কোনো বেয়াদবির উদ্দেশ্যে ছিল না, বরং এশিয়ার লোকদের মাঝে রীতি রয়েছে যে, যখন তারা কাউকে কোনো বিষয়ে সম্মত করাতে চায় তখন অনুনয়-বিনয়ের ভঙ্গিতে অন্যের দাড়িতে হাত দেয় অথবা নিজেরই দাড়িতে হাত দিয়ে বলে যে, দেখো! আমি একজন বয়স্ক মানুষ এবং গোত্রের একজন নেতা। আমার কথায় রাজি হয়ে যাও। অতএব সেই সর্দারও মিনতি করে তাঁর (সা.) দাড়িতে হাত দিয়েছে। এটি দেখে একজন সাহাবী সামনে এগিয়ে যান আর নিজ তরবারির হাতল দিয়ে আঘাত করে বলেন, নিজের অপবিত্র হাত পেছনে সরাও। সেই সর্দার তরবারির হাতল দিয়ে আঘাতকারী ব্যক্তিকে চিনতে পেরে বলে, তুমি কি সেই ব্যক্তি যার ওপর আমি অমুক সময় অনুগ্রহ করেছিলাম? এটি শুনে সেই সাহাবী নিশ্চুপ হয়ে যান আর পেছনে সরে যান। সর্দার পুনরায় অনুনয়বিনয়ের সুরে তাঁর (সা.) দাড়িতে হাত দেয়। সাহাবীরা বলেন যে, সেই সর্দারের এভাবে হাত দেওয়াতে আমাদের অত্যন্ত রাগ হচ্ছিল, কিন্তু তখন আমরা এমন কোনো ব্যক্তিকে খুঁজে পাচ্ছিলাম না যার প্রতি সেই সর্দারের কোনো অনুগ্রহ নেই। অর্থাৎ সেই কাফির সর্দার বহু লোকের প্রতি অনুগ্রহ করেছিল। তখন আমাদের বাসনা হলো যে, হায়! যদি আমাদের মাঝে এমন কোনো ব্যক্তি থাকতো যার ওপর এই সর্দারের কোনো অনুগ্রহ নেই।

তখনই আমাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি সামনে এগিয়ে যায় যে আপাদমস্তক শিরস্ত্রাণ ও বর্মে আবৃত ছিল, আর অত্যন্ত উত্তেজিত কণ্ঠে সেই সর্দারকে সম্বোধন করে বলে, নিজের অপবিত্র হাত সরিয়ে নাও! তিনি ছিলেন হযরত আবু বকর (রা.), যিনি একথা বলেছিলেন। সেই সর্দার যখন তাকে চিনতে পারে তখন বলে, হ্যাঁ, আমি তোমাকে কিছু বলতে পারবো না, কেননা তোমার প্রতি আমার কোনো অনুগ্রহ নেই।"

(হিন্দুস্তানী উলঝনোঁ কা আসান তরীন হাল, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-১৮, পৃ: ৫৬০)

অতঃপর হুলায়েস বিন আলকামা কেনানী, যে আহাবীশ-এর সর্দার ছিল ; যেমনটি আমি বলেছি, আহাবীশ কুরাইশদের মিত্র গোত্র ছিল আর তারা হাবশী নামক পাহাড়ের পাদদেশে অঙ্গীকার করেছিল বিধায় তাদেরকে আহাবীশ বলা হয়। সে বলে, আমাকে মহানবী (সা.)-এর কাছে যেতে দাও। তখন কুরাইশরা বলে যে, যাও। সে যখন আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-কে উঁচু স্থান থেকে দেখে তখন আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) বলেন, এ হলো অমুক ব্যক্তি যে এমন গোত্রের সদস্য যারা কুরবানীর পশুর সম্মান করে; আর সাহাবীদের বলেন, তাকে দেখানোর জন্য কুরবানীর পশুগুলো সামনে নিয়ে আসো। এতে তারা পশুগুলোকে সম্মুখ দিয়ে নিয়ে যান। যখন সে উপত্যকার কিনারায় ঐ পশুপাল দেখল যেগুলোর গলায় মালা পরানো ছিল; সেগুলো দীর্ঘদিন গলায় থাকার ফলে সেগুলোর গলার পশম ঝরে গিয়েছিল। সেই পশুগুলো বার বার হাঁকডাক দিচ্ছিল। সাহাবীরা তালবিয়া পাঠ করতে করতে তাকে স্বাগত জানায় এবং তারা সেখানে আধা মাস ধরে অবস্থান করছিলেন। তারা কোনো সুগন্ধি লাগান নি; অর্থাৎ সাহাবীরা কোনো ধরনের সুগন্ধি লাগান নি আর তাদের মাথার চুলও ছিল এলোমেলো। যখন সে এই দৃশ্য দেখল তখন সে বলে উঠল, সুবহানাল্লাহ্! বায়তুল্লাহ্ যাওয়া থেকে তাদের বাধাপ্রাপ্ত হওয়া উচিত হবে না। তাৎক্ষণিক তার হৃদয় বিগলিত হলো। সে বলে, আল্লাহ্ তা'লা এ বিষয়ের অনুমতি দেন নি যে, লাখাম, জুযাম, কিন্দা আর হিমইয়ার গোত্রগুলো হজ্জ করবে আর আব্দুল মুত্তালিবের পুত্রকে বাধা দেওয়া হবে! তাদেরকে বায়তুল্লাহ্ যাওয়া থেকে বাধা প্রদান করা কুরাইশের উচিত হবে না। কা'বার প্রভুর শপথ! কুরাইশ ধ্বংস হয়ে যাবে। এরা যে কেবল উমরা করার উদ্দেশ্যে এসেছে! [সে মুসলমানদের স্বপক্ষে এ কথা বলে।] এ কথা শুনে মহানবী (সা.) বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ, হে বনু কিনানার ভাই! বিষয়টি ঠিক তা-ই (যা তুমি বলেছ)। তাকে তিনি (সা.) এই উত্তর দিলেন। সে এতটাই প্রভাবিত হয় যে, কুরাইশের কাছে গিয়ে বলে, আমি এমন বিষয় দেখেছি যে কারণে বলছি যে, মুসলমানদের বাধা দেওয়া বৈধ হবে না। আমি (তাদের) পশুগুলোকে দেখেছি; গলায় মালা পরার কারণে সেগুলোর পশম ঝরে পড়েছে আর সেই মালাগুলো সেগুলোর গলায় দীর্ঘ দিন ধরে ঝুলছে। তাদের লোকদের মাথার চুল এলোমেলো হয়ে আছে আর এসবের কারণ হলো, তারা বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ করতে চায়। আর আল্লাহ্‌র শপথ! আমরা এ বিষয়ে তোমাদের সাথে সন্ধিচুক্তি করি নি; আমরা তোমাদের সাথে এ বিষয়েও সন্ধিচুক্তি করি নি যে, তোমরা প্রত্যেক সেই ব্যক্তিকে বাধা প্রদান করবে যে এই বায়তুল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও সম্মান প্রতিষ্ঠাকারী হবে, এর অধিকার প্রদান করবে আর তাদের কুরবানীর পশুগুলোকে নিয়ে সেগুলোর (জবাই হওয়ার) স্থানে নিয়ে যেতে চাইবে। আর সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তোমরা তাদেরকে কা'বায় যাওয়ার পথ ছেড়ে দাও অন্যথায় আমি আমার লোকদেরকে নিয়ে তোমাদের সঙ্গ ছেড়ে চলে যাব।

[সে কুরাইশকে বলে, তাদেরকে উমরার উদ্দেশ্যে যাওয়ার অনুমতি দাও।] কুরাইশ বলে, হে হুলায়েস! তুমি শান্ত হও যেন আমরা আমাদের মনমতো শর্তগুলো তাদেরকে মানাতে পরি। অপর এক রেওয়ায়েতে এসেছে, কুরাইশ বলে যে, তুমি বসে পড়ো; তুমি এক মরুবাসী (অর্থাৎ গাওয়া,) তুমি কিছুই জানো না! তুমি মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছ থেকে যা কিছু শুনেছ এবং দেখেছ তা সবই প্রতারণা এবং ধোঁকা, নাউযুবিল্লাহ্।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৪৫)

এই সফরে হযরত কা'ব বিন উজরার জন্য ইহরাম বাঁধা অবস্থায় মাথা মুণ্ডন করার ছাড়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। এর বিস্তারিত বিবরণ হল, হযরত কা'ব বিন উজরা স্বয়ং বর্ণনা করেন, আমরা হুদাইবিয়ায় মহানবী (সা.)-এর সাথে ছিলাম। আমরা ইহরাম বাঁধা অবস্থায় ছিলাম। মুশরিকরা আমাদেরকে ঘিরে রেখেছিল। আমার মাথার চুল লম্বা ছিল আর উকুন আমার মুখের ওপর ঝরে পড়তে থাকে। তিনি (সা.) আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। (আমাকে দেখে) বললেন, তোমার মাথার উকুন কি তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে? আমি বললাম, জি হুযুর। তিনি (সা.) বললেন, তোমার এই কষ্ট এত বেড়ে যাবে তা আমার ধারণা ছিল না। তিনি (সা.) আমাকে মাথা মুণ্ডন করার নির্দেশ দিলেন। [বললেন, তুমি আগেই মাথা মুণ্ডন করতে পারো।] আল্লাহ্ তা'লা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন:

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ بِهٖۤ اَذًى مِّنْ رَّاْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ

(সূরা বাকারা, আয়াত: ১৯৭)

অতএব তোমাদের মাঝে কেউ যদি অসুস্থ হয় বা তার মাথায় যদি কষ্ট থাকে তবে কিছুটা রোযার মাধ্যমে অথবা সদকা দিয়ে অথবা কুরবানী উপস্থাপন করে ফিদিয়া দিতে হবে। অর্থাৎ এমন অবস্থায় কষ্টের মাঝে এমনটি করা যেতে পারে, তথা মাথা মুড়ানো বৈধ।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৩৫)

এই সময়ের মাঝে কুরাইশের মিকরেয বিন হাফসকেও দূত হিসেবে প্রেরণের উল্লেখ পাওয়া যায়। পূর্বে যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, কুরাইশের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে বিভিন্ন লোক দূত হিসেবে মহানবী (সা.)-এর কাছে আসতে থাকে। যাহোক, তাদের মাঝে মিকরেয বিন হাফস-এরও উল্লেখ পাওয়া যায়। সে-ও কুরাইশকে বলে যে, আমাকে মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছে যেতে দাও। যখন সে আসে তখন মহানবী (সা.) তাকে দেখে বলেন, এ একজন প্রতারক লোক; আর রেওয়ায়েতে 'ফাজের' শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। সে যখন মহানবী (সা.)-এর কাছে আসে তখন তিনি (সা.) তাকেও সেই কথা বলেন যে কথা উরওয়া এবং বুদাইলকে বলেছিলেন। এরপর সে নিজ সাথীদের কাছে ফেরত চলে যায় এবং তাদেরকে সেসব কথা বলে যে কথা মহানবী (সা.) তাকে বলেছিলেন।

মহানবী (সা.)-এর হযরত খিরাশ বিন উমাইয়্যাকে কুরাইশের কাছে প্রেরণেরও উল্লেখ পাওয়া যায়, অর্থাৎ তিনিও (সা.) নিজের একজন দূত প্রেরণ করেন। মুহাম্মদ বিন ইসহাক লেখেন, মহানবী (সা.) নিজ উটে হযরত খিরাশ বিন উমাইয়্যাকে কুরাইশের কাছে প্রেরণ করেন; সেই উটের নাম ছিল সা'লেব; যেন মুসলমানদের আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কুরাইশকে অবগত করতে পারেন। তখন ইকরামা বিন আবু জাহল উটের পায়ের গোড়ালি কেটে ফেলে। ইকরামা তাকেও অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর দূতকেও হত্যা করতে মনস্থ করে, কিন্তু আহাবীশ তাকে নিবৃত্ত করে। তখন সে হযরত খিরাশকে ছেড়ে দেয় আর তিনি (রা.) মহানবী (সা.)-এর কাছে ফেরত চলে আসেন এবং মহানবী (সা.)-কে তার সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনার বর্ণনা দেন। (সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৪৬)

মোটকথা, কুরাইশ শান্তি বিঘ্নিত করা অব্যাহত রাখে কিন্তু মহানবী (সা.) ক্ষমা করতে থাকেন।

এর বিস্তারিত উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এভাবে লেখেন: মক্কার কুরাইশ এতেই থেমে থাকে নি, বরং তারা উত্তেজনায় অন্ধ হয়ে এই পরিকল্পনাও করে যে, যেহেতু মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবীরা মক্কার এত কাছে এবং মদীনা থেকে এতটা দূরে এসে পড়েছেন, তাই তাদের ওপর আক্রমণ করে যতটা সম্ভব তাদের ক্ষতিসাধন করা উচিত। অতএব এই উদ্দেশ্যে তাদের চল্লিশ থেকে পঞ্চাশজনের একটি দল হুদাইবিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে আর সে সময় উ ভয় পক্ষের মাঝে চলমান সংলাপের ছদ্মাবরণে ঐ লোকদের নির্দেশনা দেয়, (তারা যেন) ইসলামী শিবিরের আশেপাশে দৃষ্টি রাখে আর সুযোগ বুঝে মুসলমানদের ক্ষতি করতে থাকে। বরং কতিপয় রেওয়ায়েত থেকে এটিও জানা যায় যে, তারা সংখ্যায় ছিল আশিজন আর এই সুযোগে কুরাইশ মহানবী (সা.)-কে হত্যারও ষড়যন্ত্র করে। কিন্তু যা-ই হোক, খোদার কৃপায় মুসলমানরা নিজ নিজ অবস্থানে সতর্ক ছিল। একসময় কুরাইশের এই ষড়যন্ত্রের পর্দা ফাঁস হয়ে যায় আর এদের সকলকে গ্রেফতার করা হয়। পবিত্র মাসে হেরেমের এলাকায় মক্কাবাসীদের এমন আচরণে মুসলমানরা ভীষণ ক্ষুব্ধ হন, কিন্তু মহানবী (সা.) তাদেরকে ক্ষমা করে দেন আর মীমাংসার প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে কোনোরূপ বাধা সৃষ্টি হতে দেন নি।"

(সীরাত খাতামান্নবীঈন, পৃ: ৭৫৯-৭৬০)

এরপর একটি অতি প্রসিদ্ধ ঘটনার উল্লেখ আছে। হযরত উসমান (রা.)-কেও মহানবী (সা.) দূত হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন।

আল্লামা বায়হাকী, উরওয়ার পক্ষ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এরপর মহানবী (সা.) হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)-কে ডেকে পাঠান যেন তাকে কুরাইশের কাছে প্রেরণ করতে পারেন। তিনি (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! কুরাইশ আমার শত্রুতার বিষয়ে অবগত তাই আমি আমার প্রাণের ভয়ে শঙ্কিত, আর বনু আদীর মাঝে এমন কেউনেই যে আমার সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারে। আর হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনি বললে আমি যেতে পারি। মহানবী (সা.) তাকে আর কিছু বলেন নি। হযরত উমর (রা.) বললেন, হে আল্লাহ্ র রসূল! আমি আপনাকে এমন এক ব্যক্তির খোঁজ দিচ্ছি মক্কায় যার সম্মান আমার চেয়ে বেশি আর সে উঁচু বংশ মর্যাদার, যারা তার নিরাপত্তা দেবে এবং আপনার বার্তা যাআপনি ইচ্ছা করেন- তা পৌঁছে দিবে। আর সেই ব্যক্তি হলেন হযরত উসমান বিন আফফান (রা.)। হযরত উমর (রা.) প্রাণের ভয়ে এই কথা বলেন নি। তিনি বলেছিলেন, আমি গেলে আমাকে হত্যা করবে। বার্তা প্রেরণের যে উদ্দেশ্য সেটা পূর্ণ হবে না। একটি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়ে যাবে। এজন্য ভালো হয় যদি আমি না গিয়ে হযরত উসমান (রা.) যান। মহানবী(সা.) হযরত উসমানকে (রা.) ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, তুমি কুরাইশের কাছে গিয়ে তাদেরকে সংবাদ দাও, আমরা যুদ্ধ করার জন্য আসি নি, উমরা করার উদ্দেশ্যে এসেছি।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৪৬)

এর বিস্তারিত বিবরণ হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) 'সীরাত খাতামান্ নবীঈন' পুস্তকে এভাবে দিয়েছেন, মহানবী (সা.) হযরত উসমান (রা.)-কে মক্কা যাবার এবং কুরাইশকে মুসলমানদের শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্য ও উমরার ইচ্ছা সম্পর্কে অবহিত করেন। তিনি (সা.) হযরত উসমান (রা.)-কে নিজের পক্ষ থেকে একটি লিখিত বার্তাও দেন যা কুরাইশ নেতৃবৃন্দের উদ্দেশ্যে ছিল। এই লিখিত বার্তায় মহানবী (সা.) নিজের আগমনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন এবং কুরাইশদের নিশ্চয়তা প্রদান করেন, আমাদের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র একটি ইবাদত পালন করা; আমরা শান্তিপূর্ণভাবে উমরা পালন করে ফেরত চলে যাব। তিনি (সা.) হযরত উসমানকে (রা.) এ কথাও বলেন, মক্কায় যেসব দু র্বল মুসলমান রয়েছে তাদের সাথেও সাক্ষাৎ করার চেষ্টা করবে এবং তাদের সাহস বৃদ্ধি করবে আর বলবে, আর কিছুদিন ধৈর্য ধারণ করো, খোদা অতিশীঘ্র সাফল্যের দ্বার উন্মোচিত করবেন।" মহানবী (সা.)-এর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল।

"এই বার্তা নিয়ে হযরত উসমান (রা.) মক্কায় গেলেন এবং আবু সুফিয়ানের সাথে সাক্ষাৎ করলেন, যে সেই সময়ে মক্কার সবচেয়ে বড়ো নেতা ও হযরত উসমান (রা.)-র নিকটাত্মীয় ছিল; এরপর মক্কাবাসীদের একটি সাধারণ সভায় উপস্থিত হলেন। এই জমায়েতে হযরত উসমান (রা.) মহানবী (সা.)-এর লিখিত বার্তাটি উপস্থাপন করেন যেটি কুরাইশের বিভিন্ন নেতা পৃথক পৃথকভাবেও পর্যালোচনা করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সবাই নিজেদের অহমিকা বজায় রাখে যে, যা-ই হোক না কেন, মুসলমানরা এবছর মক্কায় প্রবেশ করতে পারবে না। হযরত উসমান (রা.)-র তাগাদা প্রদানে কুরাইশরা বলল, যদি তোমার বেশি আগ্রহ থাকে তাহলে আমরা তোমাকে ব্যক্তিগতভাবে বায়তুল্লাহ্ তাওয়া ফ করার অনুমতি দিচ্ছি। হযরত উসমানকে (রা.) প্রস্তাব দিল যে, আপনি তাওয়াফ করে নিন। কিন্তু এর চেয়ে বেশি সম্ভব নয়। হযরত উসমান (রা.) বললেন, এটি কীভাবে সম্ভব যে, মক্কার বাহিরে মহানবী (সা.)-এর পথরোধ করে রাখা হবে আর আমি তাওয়াফ করব? কুরাইশরা কোনোভাবেই সম্মত হয় নি এবং পরিশেষে হযরত উসমান (রা.) নিরাশ হয়ে ফেরত আসার প্রস্তুতি নেন । এই সময়ে মক্কার দুষ্কৃতকারী লোকেরা একটি দু রভিসন্ধির অধীনে হযরত উসমান (রা.) এবং তাঁর সঙ্গীদের মক্কায় আটক করে। তারা সম্ভবত ধারণা করেছিল, এভাবে সন্ধিচুক্তিতে আমরা আমাদের উদ্দেশ্য অনুযায়ী বেশি লাভজনক শর্ত মানাতে পারব। এর ফলে মুসলমাদের মাঝে এই গুজব ছড়িয়ে পড়ল, মক্কাবাসীরা হযরত উসমান (রা.)-কে হত্যা করেছে।"

যখন এই সংবাদ পৌঁছল তখন মহানবী (সা.) সেই বয়আত গ্রহণ করলেন যাকে 'বয়আতে রিযওয়ান' বলা হয়। এর বিস্তারিত বিবরণে লেখা আছে,হযরত উসমানের শাহাদাতের সংবাদ যখন হুদাইবিয়াতে পৌঁছল তখন মুসলমানদের মাঝে ভীষণ উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল। কেননা হযরত উসমান (রা.) মহানবী (সা.)-এর জামাতা এবং সবচেয়ে সম্মানিত সাহাবীদের মাঝে গণ্য হতেন। আর তিনি মক্কায় ইসলামী দূত হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন। আর এই দিনগুলো সম্মানিত মাসভুক্ত দিন ছিল এবং স্বয়ং মক্কা 'হারাম' অর্থাৎ পবিত্র এলাকা ছিল। মহানবী (সা.) তৎক্ষণাৎ ঘোষণা দিয়ে সমস্ত মুসলমানদের একটি বাবলা গাছের নিচে একত্রিত করলেন। যখন সাহাবীরা একত্রিত হয়ে গেলেন তখন মহানবী (সা.) এই সংবাদের উল্লেখ করে বলেন, যদি এ খবর সত্য হয় তাহলে খোদার কসম! উসমানের (রা.) প্রতিশোধ না নেওয়া পর্যন্ত আমরা এই স্থান পরিত্যাগ করব না। অতঃপর তিনি (সা.) সাহাবীদের উদ্দেশ্য করে বলেন, আসো, তোমরা আমার হাতের ওপর হাত রেখে, ইসলামে বয়আত গ্রহণের রীতি অনুসারে, এই প্রতিজ্ঞা করো যে, তোমাদের কেউ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না। নিজ জীবন বাজি রেখে হলেও কোনো অবস্থাতেই নিজেদের (যুদ্ধের) স্থান পরিত্যাগ করবে না।"

এ ঘোষণার পর সাহাবীরা বয়আতের জন্য এমনভাবে এগিয়ে এলেন যে, একজন আরেকজনের ওপর দিয়ে ঝাঁপ দিচ্ছিলেন। তখন সর্বসাকুল্য সেই চৌদ্দ-পনেরো'শ মুসলমানের এক এক ব্যক্তি যেন নিজেদের প্রিয় প্রভুর সামনে দ্বিতীয়-বারের মতো নিজেদের বিক্রি করে দিলেন।

যখন বয়আত নেওয়া হচ্ছিল মহানবী (সা.) তখন তাঁর বাম হাত ডান হাতের ওপর রেখে বললেন, এটি উসমানের হাত, কেননা সে যদি এখানে উপস্থিত থাকতো তাহলে এই পবিত্র ব্যাবসায় কারোর চেয়ে পিছিয়ে থাকতো না। কিন্তু এই মুহূর্তে তিনি খোদা এবং তাঁর রসূলের কাজে ব্যস্ত।"

এভাবে এক বিদ্যুৎতুল্য দৃশ্যের পরিসমাপ্তি ঘটে। ইসলামের ইতিহাসে এই বয়আত 'বয়আতে রিযওয়ান' নামে প্রসিদ্ধ। অর্থাৎ সেই বয়আত যাতে মুসলমানরা তাদের প্রভুর পূর্ণ সন্তুষ্টির পুরস্কার লাভ করেছিল। পবিত্র কুরআনেও বিশেষভাবে এই বয়আতের উল্লেখ রয়েছে। যেমনটি আল্লাহ তা'লা বলেন

لَقَدۡ رَضِیَ اللّٰہُ عَنِ الۡمُؤۡمِنِیۡنَ اِذۡ یُبَایِعُوۡنَکَ تَحۡتَ الشَّجَرَۃِ فَعَلِمَ مَا فِیۡ قُلُوۡبِہِمۡ
فَاَنۡزَلَ السَّکِیۡنَۃَ عَلَیۡہِمۡ وَ اَثَابَہُمۡ فَتۡحًا قَرِیۡبًا

(এরপর শেষের পাতায়.....)

লাজনা ইমাউল্লাহ্ আয়ারল্যাণ্ড –এর ন্যাশনাল মজলিসে আমলার সঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.)–এর বৈঠক।

দোয়ার পর হুযুর আনোয়ার (আই.) একে একে সকলের সঙ্গে পরিচয় করেন।

লাজনার নায়েব সদরকে হুযুর আনোয়ার জিজ্ঞাসা করেন যে তিনি ন্যাশনাল আমেলা বা কার্যসমিতিতে কি হিসেব আছেন? কেননা নায়েব সদরের কাছে কোনও একটি বিভাগ থাকাও জরুরী। যাতে সদর লাজনা উত্তর দেন যে তিনি স্থানীয় সদর লাজনা পদেও রয়েছেন।

ওয়াকফে নও সেক্রেটারী সম্পর্কে হুযুর আনোয়ার বলেন, লাজনাদের ন্যাশনাল কার্যসমিতিতে ওয়াকফে নওয়া সেক্রেটারীর তো কোন পদ নেই। হুযুর আনোয়ার বলেন, তাঁকে সহকারি-সদর হিসেবে নিয়োগ করুন আর ওয়াকফাতে নও সংক্রান্ত কাজে লাগান।

সেক্রেটারী তবলীগকে হুযুর আনোয়ার (আই.) তবলীগি কার্যক্রম এবং লিফলেট বিতরণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন, মিনা বাজার প্রসঙ্গেও জিজ্ঞাসা করেন এই অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছিল কি না। যার উত্তরে সদর লাজনা বলেন, তারা সেই এলাকায় আছে যেখানে ঘর ভাড়ায় নেওয়া হয়, মানুষকে মিনা বাজারে আসার আমন্ত্রণ জানানো হয় যাতে বেশি করে লোক আসে আর কেনাকাটার পাশাপাশি জামাতের সঙ্গে পরিচয় বৃদ্ধি পায়। মিনা বাজার তবলীগের একটি উৎকৃষ্ট মাধ্যম। আমরা সেখানে তবলীগ কর্ণার তৈরী করে থাকি, যেখানে বই এবং অন্যান্য লিটারেচর রাখি। মিনা বাজারে পর্দার রীতি বজায় রেখে লাজনার সদস্যারা লিফলেট বিতরণ করে থাকে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনারা মানুষকে আসার জন্য যে নেমন্ত্রণপত্র দিয়েছেন তা ঠিকই করেছেন। ছোট মেয়েরা মিনা বাজারে যাবে আর লাজনারাও সেখানে গিয়ে তাদের পথনির্দেশনা দিবে।

হুযুর আনোয়ার তবলীগ সেক্রেটারীকে নির্দেশ দিতে গিয়ে বলেন, তবলীগের জন্য আপনারা সেমিনারের আয়োজন করুন। যে সব আহমদী ছাত্রীরা স্কুল কলেজে আছে তারা তাদের স্কুল ও কলেজের সঙ্গে যোগাযোগ করুক এবং সেমিনারের আয়োজন করুক।

তবলীগ সেক্রেটারী বলেন, অর্থাভাবের কারণে আমরা এটি করি না।’ হুযুর বলেন, এখন কেন্দ্রের অংশও আপনাদের দিয়ে দিয়েছি। সামর্থবানদের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য নিন। যুক্তরাষ্ট্রে এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্য যাতায়াতের খরচ তারা নিজেরাই বহন করে থাকে। যারা সামর্থবান তাদের কাছ থেকে নিন। যাদের স্বামী বেশি উপার্জন করে, সেই সব মহিলাদের কাছ থেকে নিন।

সদর লাজন সাহেব বলেন, এবছর হুযুর আনোয়ার যে মরকযের অংশ আমাদেরকে দিয়েছিলেন, তা থেকে আমরা বই-পুস্তক ক্রয় করেছি। হুযুর আনেয়ার বলেন, আগামী পাঁচ বছরের বাজেট আপনারাই রাখুন আর তা তবলীগের কাজে ব্যয় করুন, তবলীগের নতুন পথ বের করুন। তবলীগি কার্যক্রম সম্পর্কে তবলীগ সেক্রেটারী বলেন, ‘আমরা বিভিন্ন স্কুলকে চিঠি লিখেছি আর জামাত আন্তঃধর্মীয় অনষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। হুযুর আনোয়ার বলেন, চিঠি লিখে কিছু হবে না। নিজেরা ঘর থেকে বের হন, দ্বিতীয় বার যান, বার বার যান। নিজেদের মেয়েদেরকে বলুন মহিলাদের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়াতে এবং নিজেদেরকে পরিচিত করে তুলতে। আন্তঃধর্মীয় অনুষ্ঠান তো জামাত করেছিল, লাজনাদের পক্ষ থেকে কিছু করুন।

হুযুর আনোয়ারের জিজ্ঞাসার উত্তরে লাজনা সদর সাহেবা বলেন, মসজিদের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ১৫জন অতিথি লাজনাদের মাধ্যমে অংশগ্রহণ করেছে। যা শুনে হুযুর আনোয়ার বলেন, লাজনারা যেন পর্দার মধ্যে থেকে তবলীগ করে আর স্বামীদের সঙ্গে পরামর্শ করতে পারে এ বিষয় নিয়ে। তবলীগের কমিটি গঠন করুন। পরিকল্পনা তৈরী করুন। আমার কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠান এবং সব শেষে তা বাস্তবায়িত করুন। প্রতিবেশীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তুলুন।

হুযুর আনোয়ার বলেন, স্বামী এবং ছেলেমেয়েদের থেকেই আপনারা অব্যহতি পান না। তবলীগও জরুরী বিষয় আর এর পাশাপাশি তরবীয়তও জরুরী।

সদর লাজনা প্রশ্ন করেন যে আমরা কি তবলীগের জন্য স্টল লাগিয়ে লোকেদের পামফ্লেট বিতরণ করতে পারি? আমরা পর্দার মধ্যে থেকে এভাবে কি তবলীগ করতে পারি?

হুযুর আনোয়ার বলেন: তবলীগি স্টল লাগান। পুরুষরা তো স্টল লাগায়। আপনারাও পর্দার মধ্যে থেকে স্টল লাগাতে পারেন। হুযুর আনোয়ার বলেন, আমি যখন পার্লামেন্টে যাই, সেখানে এক ভদ্রমহিলা আমাকে বলেছিল যে আমাদের মেয়েদের মধ্যে নাকি স্বাধীনতা নেই। আপনারা স্টল লাগাতে পারেন। স্বাধীনতার নামে অনেকে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করে ফেলে। মধ্যপন্থা অবলম্বন করুন। স্বাধীনতার অপপ্রয়োগ করবেন না।

ইশাআত সেক্রেটারী হুযুর আনোয়ারের সমীপে ‘মরিয়ম’ পত্রিকা এবং লাজনাদের ন্যাশনাল সিলেবাস উপস্থাপন করেন। হুযুর আনোয়ার বলেন, এটি তো আপনার অনেক বড় বানিয়ে দিয়েছেন। এটা কতটা মেনে চলা হয়। মরিয়ম পত্রিকার প্রকাশনা প্রসঙ্গে হুযুর আনোয়ারের জিজ্ঞাসার উত্তরে ইশাআত সেক্রেটারী বলেন, ‘এই মরিয়ম পত্রিকা আমরা যুক্তরাজ্য থেকে প্রকাশ করে থাকি কেননা, আয়ার্যাণ্ডে ছাপার খরচ অনেক বেশি।’

হুযুর আনোয়ার নির্দেশ দেন যে ওয়াকফাতে নওদের পত্রিকা ‘মরিয়ম’ও আনিয়ে নিয়ে বিতরণ করুন।

মজলিসে শূরা আয়োজন প্রসঙ্গে হুযুর আনোয়ার নির্দেশ দেন যে লাজনারা নিজেদের শূরার আয়োজনও করবে যেখানে ন্যাশনাল আমেলা বা কর্মসমিতি ছাড়াও প্রতি দশ জন সদস্যা পিছু একজন সদস্যাকে নির্বাচিত করুন।

সেক্রেটারী মাল সম্পর্কে হুযুর আনোয়ার জিজ্ঞাসা করলে সদর লাজনা বলেন, সেক্রেটারী মাল ডাক্তার রুবিনা সাহেবা অসুস্থ। কিন্তু তিনি এই কাজ অত্যন্ত দায়িত্বের সঙ্গে সম্পাদন করে এসেছেন।এখন তিনি ভগ্ন স্বাস্থ্য। যা শুনে হুযুর আনোয়ার বলেন, তাঁর স্থানে অন্য কাউকে সেক্রেটারী হিসেবে নিযুক্ত করুন।

সদর সাহেবা চাঁদার অর্থ জামাতের একাউন্টে জমা রাখার বিষয়ে কিছু জটিলতার উল্লেখ করলে হুযুর আনোয়ার প্রবন্ধন সম্পর্কিত কয়েকটি দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি বলেন, আয়-ব্যায়ের হিসেব রাখুন। যেভাবে আপনাদের বাজেট তৈরী হয় সেভাবেই খেয়াল রাখুন।

সেক্রেটারী তরবীয়ত প্রশ্ন করেন যে আমরা লাজনাদের তরবীয়ত কিভাবে করব?

হুযুর আনোয়ার বলেন সর্বপ্রথম আমলা সদস্যরা নিজেদের সংশোধন করুক। মানুষের পিছনে নাছোড় হয়ে পড়ে থাকবেন না। বার বার উপদেশ দিন। ধৈর্য ও উৎসাহ নিয়ে তাদেরকে বোঝান। প্রত্যেক ব্যক্তির পৃথক পৃথক মানসিকতা হয়ে থাকে, সেই অনুসারে তাদের সঙ্গে আচরণ করুন।

তরবীয়ত সেক্রেটারী বলেন, পারিবারিক সাক্ষাতপর্বে যদি তরবীয়তি বিষয়ে কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়ে থাকে যেগুলির সংশোধন আবশ্যক, তবে হুযুর আমাদের পথনির্দেশনা প্রদান করুন। হুযুর আনোয়ার বলেন, লাজনারা ঠিক আছে, তাদেরকে সন্তান-সন্ততির তরবীয়তের বিষয়ে উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত।

হুযুর আনোয়ারের প্রশ্নের উত্তরে সদর লাজনা সাহেবা বলেন, এখানে ১২২ জন লাজনা রয়েছে। হুযুর আনোয়ার বলেন এই সংখ্যা তো একটি মহল্লার সমান। আপনাদের এদের দেখাশোনা করা কঠিন হচ্ছে!

নাসেরাত সেক্রেটারী বলেন, নাসেরাতদের সংখ্যা ৩১জন। হুযুর আনোয়ার বলেন, ভবিষ্যতে ভাল লাজনা পেতে হলে ভাল নাসেরাত গড়ে তুলুন।

নাসেরাতদের ক্লাসে একটি মেয়ে পর্দার বিষয়ে প্রশ্ন করেছিল যে পর্দা করার সঠিক বয়স কোনটি? আপনারা যদি যুক্তরাষ্ট্র সফরের পর্দা সংক্রান্ত আমার ভাষণগুলি শুনে থাকেন, সেখানে আমি এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

মেয়েদেরকে বাল্যাবস্থাতেই লজ্জাশীল পোশাক পরান। যাতে সেই পোশাকে তারা অভ্যস্ত হয়। যদি প্রথমে হাতহীন জামা ও ছোট ছোট পোশাক পরাতে থাকেন তবে পরবতীতে হঠাৎ করে সে লজ্জাবতী হয়ে উঠবে না। মায়েদেরকে তরবীয়ত করতে হবে। শৈশবকাল থেকেই এই চিন্তাধারা তৈরী করুন যে তাদেরকে লজ্জাশীল বানাতে হবে।

হুযুর আনোয়ার আফ্রিকার উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেন, অনেক মহিলার কাছে পোশাক থাকে না, কিন্তু আহমদীয়াত গ্রহণের পর তারা নিজেদেরকে পূর্ণ পোশাকে আবৃত রাখে আর এখানে এসে তো তারা পুরো পোশাক পরে। কিন্তু পাকিস্তানী মেয়েরা যখন সেখান থেকে আসে, তখন তাদের পরনে বোরকা থাকে আর এখানে ইউরোপে এসে পর্দাহীন হয়ে পড়ে।

হুযুর আনোয়ার তালীম সেক্রেটারীকে বলেন, আপনি নিজের পরিবারে একমাত্র আহমদী। আপনার পিতামাতা জামাত সম্পর্কে কি মনোভাব পোষণ করেন? আপনার বাবাকে জুমাতেও দেখেছি, তিনি খুতবাও শুনেছেন। এ সম্পর্কে তিনি কি বলেন?

তালীম সেক্রেটারী বলেন, জামাত সম্পর্কে আমার বাবা-মা এর ধারণা খুব ভাল। তারা প্রতি জুমায় হুযুর আনোয়ারের খুতবা শোনেন আর অনেক সময় মিশন হাউসে জুমআর নামায পড়েন। এছাড়া

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian
Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-10 Thursday, 2-9 Jan 2025 Issue No.1-2

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

অর্থ: নিশ্চয় আল্লাহ্ মু’মিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন যখন তারা গাছের নিচে তোমার হাতে বয়আত করছিল এবং তাদের হৃদয়ে যা ছিল তা তিনি জানতেন। সুতরাং তিনি তাদের ওপর প্রশান্তি অবতীর্ণ করলেন এবং তাদেরকে এক আসন্ন বিজয়ের (সুসংবাদ) দান করলেন। (সূরা ফাতহ্: ১৯)

সাহাবীরাও সর্বদা অত্যন্ত গর্বের সাথে এবং ভালোবাসার সাথে এই বয়আতের উল্লেখ করতেন। তাদের মধ্যে অধিকাংশ পরবতী আগমনকারীদেরও বলতেন, তোমরা তো মক্কা বিজয়কে অনেক বড়ো কিছু মনে করে থাকো, কিন্তু আমরা বয়আতে রিযওয়ানকে বিজয় মনে করি। আর এতে কোনো সন্দেহ নেই, এটি নিজ প্রভাব-প্রতাপের নিরিখে একটি মহান বিজয় ছিল; শুধুমাত্র এর দ্বারা ভবিষ্যৎ বিজয়ের দ্বার উন্মুক্ত হবার কারণেই নয়, বরং এজন্যও যে, এর মাধ্যমে ইসলামের প্রকৃত প্রেরণা যা মুহাম্মদ (সা.)-এর ধর্মের মূল কেন্দ্র ছিল- তা উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পেয়েছে। আর ইসলামের অনুসারীরা নিজেদের আমল দ্বারা এটি প্রমাণ করেছে যে, তারা নিজেদের রসূল এবং তাঁর আনীত সত্যের জন্য প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং প্রত্যেক পদক্ষেপে নিজেদের জীবন কুরবানী করতে প্রস্তুত। এজন্য সাহাবীরা বয়আতে রিযওয়ানের উল্লেখ করার সময় বলতেন, এই বয়আত মৃত্যুর অঙ্গীকারের বয়আত ছিল। অর্থাৎ অঙ্গীকারের এই বয়আত এজন্য ছিল যে, প্রত্যেক মুসলমান ইসলামের জন্য এবং ইসলামের সম্মানের খাতিরে নিজেদের জীবন বাজি রাখবে, কিন্তু তারা পিছপা হবে না। এই বয়আতের বিশেষ আরেকটি দিক এটিও ছিল যে, এ অঙ্গীকার মুখের কোনো সাময়িক স্বীকারোক্তি ছিল না যা আবেগের বশবর্তী হয়ে করা হয়েছে, বরং হৃদয়ের গভীর থেকে উৎসারিত একটি ধ্বনি ছিল যার পেছনে মুসলমানদের সমস্ত শক্তি এক বিন্দুতে জড়ো হয়েছিল।”

(সীরাত খাতামান্নবীঈন, পৃ: ৭৬০-৭৬৩)

হযরত উসমান (রা.)-র শাহাদাতের সংবাদ এবং বয়আতে রিযওয়ানের উল্লেখ হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-ও করেছেন। তিনি (রা.) তঁ ার এক বক্তৃতায় বলেন, মহানবী (সা.) যখন উসমান (রা.)-র এই ঘটনার বিষয়ে অবগত হন তখন সাহাবীদের একত্রিত করেন এবং বলেন, দূতের প্রাণ সকল রাষ্ট্রে নিরাপদ। তোমরা শুনেছ যে, উসমানকে মক্কার লোকেরা হত্যা করেছে। এ সংবাদ যদি সত্য হয় তবে আমরা জোরপূর্বক মক্কায় প্রবেশ করব; অর্থাৎ যে-সব পরিস্থিতির আলোকে আমাদের প্রথম উদ্দেশ্য ছিল, আমরা সন্ধির সাথে মক্কায় প্রবেশ করব, তা যেহেতু পরিবর্তিত হয়ে যাবে- তাই আমরা সেই অঙ্গীকার পালনে বাধ্য থাকব না। যারা এ অঙ্গীকার করতে প্রস্তুত যে, সামনে যদি অগ্রসর হতেই হয় তবে হয় বিজয় ছিনিয়ে নিয়ে ফিরব নতুবা একজন একজন করে যুদ্ধের ময়দানে মারা যাব- তারা আমার সাথে অঙ্গীকার করো। তাঁর (সা.) এই ঘোষণার সাথে সাথে পনেরোশ হজ্জযাত্রী যারা তাঁর সাথে এসেছিল, মুহূর্তের মধ্যে পনেরোশ সৈন্যে পরিণত হলো আর পাগলপারা হয়ে একে অপরের চেয়ে অগ্রসর হয়ে মহানবী (সা.)-এর হাতে অন্যদের পূর্বে নিজেকে প্রথম অঙ্গীকারকারী বানাবার চেষ্টা করল। আনুগত্যের এই অঙ্গীকার সমগ্র ইসলামের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং একে বৃক্ষের অঙ্গীকারনামা বলা হয়, কেননা যখন এ অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়েছিল তখন মহানবী (সা.) একটি বৃক্ষের নিচে বসে ছিলেন।”

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ৩০৭-৩০৮)

হুদাইবিয়া সন্ধির বিষয়ে আরো কিছু বর্ণনা আগামীতে করা হবে, ইনশাআল্লাহ্ ।

এখন আমি এটাও স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, যেমনটি সবাই জানেন, ইউরোপেও পরিস্থিতি খুব দ্রুত যুদ্ধের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ইউক্রেন ও রাশিয়ার মধ্যকার যুদ্ধ আরো বিস্তৃত হবার আশঙ্কা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইউরোপের অন্যান্য দেশকেও হুমকি দেওয়া হচ্ছে। অধিকাংশ মানুষ ও শান্তিপ্রিয় নেতৃবৃন্দ এ নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্তও রয়েছেন। যাহোক, দোয়া করুন যেন আল্লাহ্ তা’লা আহমদীদের এবং শান্তিপ্রিয় মানুষজনকে যুদ্ধের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে নিরাপদ রাখেন; আর এরা যেন যুদ্ধে এমন অস্ত্র ব্যবহার না করে যার ফলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

মুসলমান রাষ্ট্রগুলোর জন্যও দোয়া করুন যেন আল্লাহ্ তা’লা তাদেরকে বিবেকবুদ্ধি ও সুমতি দান করেন , আল্লাহ্ যেন তাদেরকে প্রকৃত সত্য বুঝার সামর্থ্য দান করেন।

দ্বিতীয়ত, এই বিষয়টির প্রতিও মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই, পরিস্থিতির যে-রূপ দ্রুত অবনতি ঘটেছে এবং ঘটছে, সেই পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে আগে থেকেই মানুষের এদিকে মনোযোগ নিবদ্ধ রয়েছে, কিন্তু তারপরও পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। নিজেদের বাড়িতে দুই-তিন মাসের খাদ্যসামগ্রী মজুদ রাখুন। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আল্লাহ্ তা’লার নৈকট্য অর্জনে সচেষ্ট হোন, তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনে সচেষ্ট হোন, তাঁর সাথে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনের ও তা দৃঢ় করার চেষ্টা করুন। আল্লাহ্ তা’লা আমাদেরকে সেই সামর্থ্য দান করুন।

✻✻✻✻

এম.টি.এ তে জলসা দেখেন, বক্তৃতাদি শোনেন এবং স্থানীয় জলসাতেও অংশগ্রহণ করেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনি তাদেরকে আহমদীয়াতের অন্তর্ভুক্ত করুন, তারা জামাত সম্পর্কে আশ্বস্ত। আপনার পিতাকে কেবল আশ্বস্ত করতে হবে। সেক্রেটারী তালিম বলেন, পিতামাতার উপর পরিবারের চাপ আছে, বড় ভাইও জামাতের বিরোধিতা করে। তার এখনও বিয়ে হয় নি। দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি। আল্লাহ্ তা’লা আমার ভাইয়ের উপর কৃপা করুন, তাকে সঠিক পথের দিশা দিন। এর ফলে আমার পিতামাতা আহমদীয়াতে চলে আসবেন।

এরপর হুযুর আনোয়ার এক আইরিশ বন্ধুর কথা উল্লেখ করে বলেন, মসজিদের উদ্বোধনের সময় সাউন্ড সিস্টেম পরিচালনার কাজে নিযুক্ত ছিল। দুই-তিন দিন এখানকার পরিবেশ এবং হুযুর আনোয়ারের উপস্থিতিতে সে ভীষণ প্রভাবিত হয়েছে। সে জানিয়েছে, বিগত ৩৫ বছর থেকে খোদার সন্ধানে ছিল। চার্চে সে খোদার দেখা পায় নি। কিন্তু এখানে খলীফাকে নামায পড়তে দেখেছে, খুতবা শুনেছে এবং সঙ্গে নামাযও পড়েছে আর এখানে খোদার সন্ধান পেয়েছে।

এরপর ওয়াকফে নও-এর সহায়ক সদর বলেন, তাঁর পরিবারও বয়আত করে আহমদীয়াতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আর তাকেও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের পক্ষ থেকে অনেক বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। হুযুর আনোয়ার বলেন, বিরোধিতার ফলে আপনার পাপ ক্ষয় হয়।

সেক্রেটারী সেহেত ও জিসমানী প্রশ্ন করেন, ‘আমরা লাজনারা দলবদ্ধভাবে ‘ওয়াক’ করতে পারি? হুযুর আনোয়ার জিজ্ঞাসা করেন ম্যারাথন দৌড়ে যেতে চান? সেক্রেটারী সাহেবা বলেন, পর্দার মধ্যে থেকে সাধারণ ‘ওয়াক’ করা যায় কি?

হুযুর আনোয়ার বলেন, পার্কে যেতে চাইলে কোন অসুবিধা নেই। ন্যাশনাল মজলিসে আমলার এই মিটিং সাড়ে আটটায় সমাপ্ত হয়।

ন্যাশানাল আমেলা মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া এবং মজলিস আনসারুল্লাহ্ আয়ারল্যাণ্ডের সঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর পৃথক পৃথক বৈঠক।

হোটেলের একটি কনফারেন্স রুমে মিটিং এর আয়োজন করা হয়েছিল। প্রথমে খুদ্দামদের সঙ্গে মিটিং আরম্ভ হয়। হুযুর আনোয়ার প্রথমে দোয়া করান।

হুযুরের প্রশ্নের উত্তরে মুতামিদ সাহেব বলেন, আমাদের তিনটি মজলিস আর খুদ্দামদের সংখ্যা ৭১জন। আমাদের নিয়মিত ন্যাশনাল ইজতেমার আয়োজন হয়, যার জন্য হলঘর বুক করা হয়। ইজতেমায় ক্রীড়া প্রতিযোগিতাও হয়। মজলিসগুলির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ আছে আর রিপোর্টও নেওয়া হয়।

হুযুর আনোয়ার মুহতামিম তরবীয়তের কাছে জানতে চান যে তিনি কি জানেন যে কতজন খুদ্দাম বিবাহিত আর কতজন অবিবাহিত? মুহাতামিম তরবীয়ত এ ব্যাপারে অনবহিত আছেন বলে জানান। হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনার তা জানা থাকা দরকার, নথিতে থাকা দরকার। মুহতামিম তাজনীদকে হুযুর আনোয়ার বলেন, যথারীতি প্রত্যেক খাদিমকে তাজনীদ ফর্ম পূর্ণ করতে বলুন। পাকিস্তান থেকে ফর্ম চেয়ে পাঠান বা যুক্তরাজ্য থেকে চেয়ে পাঠান। প্রত্যেক খাদিমের বায়োডাটা আপনাদের রেকর্ডে থাকা চাই। খাদিমের নাম, পিতার নাম,বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশা, আয়, বিবাহিত/অবিবাহিত ইত্যাদি তথ্য তাতে থাকবে।

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir